

বোধন

বোধন

(গল্প-সংকলন)

বিনয় ঘোষ

পূরবী পাব্‌লিশার্স
কলিকাতা

প্রকাশক
গিরীন চক্রবর্তী
পূরবী পাব্‌লিশার্স
৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—১১০০
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩

এক টাকা বারো আনা

প্রিণ্টার—কিশোরীমোহন নন্দী
গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেণিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা।

আমার মা'র স্মৃতি উদ্দেশ্যে—

'বোধন' লেখকের প্রথম গল্প-সংকলন। গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত এবং 'পরিচয়', 'অলকা', 'শনিবারের চিঠি', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর', 'অরণি' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত।

ডাষ্টবিন্

মা

কসাইখানা

সূর্য্যপ্রণাম

বিচার

সিলুয়েট

নগর-তীর্থ

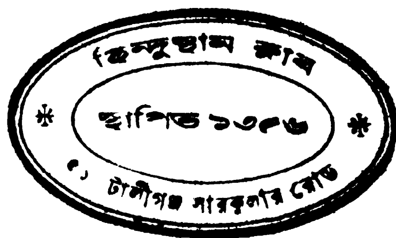
মহম্মদ ইয়াকুব

ভদ্রার বাঁধ

"মাগো! বাঁচিয়ে দে"

লুলু

কোটালপুত্র



ডাষ্টবিন্

কয়েকটি কুকুরের কর্কশ চীৎকারে সুরপতির ঘুম ভেঙে গেল। জানালার কাছে এসে সুরপতি চেয়ে দেখে নীচে রাস্তার ধারে ডাষ্টবিনের পাশে উচ্ছিষ্ট পাতা নিয়ে একপাল কুকুর কাড়াকাড়ি করছে। পাশের বাড়ীর উৎসব-কোলাহল প্রায় নীরব হয়ে এসেছে। ডাষ্টবিনের একটু দূরে জগা পাগলা কিছু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ক'রে আপন মনে খাচ্ছে আর কুকুরগুলোর সঙ্গে অনর্গল কি আবোল-তাবোল বকছে। বকুনির বিরাম নেই।

"কালো! কালো! আয়, আয়—"

একটি কুকুর লেজ নাড়তে নাড়তে তার কাছে এসে নাকী সুরে কান্না সুরু করলে। "চুপ্ কর্, চুপ্ কর্! কি হয়েছে"—গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে, "বুড়ো হয়েছিস্, কবে মরে যাবি—"

নাকী কান্না থামলো।

আর একটি কুকুর বিকটভাবে ডাকতে লাগলো বিনা কারণেই।

"চোপ্‌রাও পাজী—চোপ—"

জগা পাগলা কুকুরটিকে লক্ষ্য ক'রে একটি মাটির গ্লাস ছুড়ে মারলে। সুরপতি উপর দিকে চেয়ে দেখলো আকাশে তুলার স্তূপের মতো সাদা সাদা খণ্ডমেঘ তীরবেগে দৃষ্টিসীমা পার হ'য়ে যাচ্ছে। সাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো, তারার ভিড়।

বিশ্বাসঘাতক!

সুরপতির গা ছম্ ছম্ ক'রে ওঠে। সুব্রতার চিঠির কয়েকটি লাইন মনে পড়ে যায়ঃ

"তুমি তো জানো আমার জীবনে দুঃখের শেষ নেই। কেন তুমি আমাকে বাঁচিয়েছিলে, কেন?"

সুরপতি একবার চাইল আকাশের দিকে, একবার চাইল নীচে ডাষ্টবিনের পাশে কুকুরগুলোর দিকে। জগা পাগলা তখনও খাচ্ছে। মনে পড়ে,—

"মনে কর মাটির প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়েছো, তার জন্যে আবার দুঃখ কি?"

সুরপতির ঘরখানির এক কোণে একটি লম্বা টেবিলের উপর কতকগুলি শিশিতে নানারকম এ্যাসিড্, কয়েকটি কাচের জার্, বার্ণার, এবং আরও অনেকগুলি পরীক্ষা করবার যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আছে। ঘরখানি

ছোটখাটো একটি ল্যাবোরেটরী বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। দিনের বেলা সে এক্সপেরিমেণ্ট নিয়ে থাকে, ঘরের ভিতর দুম্ দাম্ শব্দ, গ্যাস্ ও এ্যাসিডের ঝাঁঝাল গন্ধ। সুব্রতার গা ঘিন্ ঘিন্ করে, অস্বস্তি বোধ হয়। ঘরের আর একপাশে একটি পুরাতন বুক্‌কেসে খানকতক বই—দর্শন, বিজ্ঞান সব কিছুই আছে। সুরপতি হয় পড়ে, না হয় শিশি বোতল নিয়ে পরীক্ষা করে। কি যে করে আর কি যে হয় কাকেও জানায় না! জানাবার প্রয়োজন বোধ করে না।

জানালার ফাঁক দিয়ে শুক্লপক্ষের দ্বাদশীর চাঁদের কিরণ এসে ঘর আলোকিত ক'রে দেয়। সুব্রতার ভাল লাগে না, বলে—

"ঐ ছেঁড়া বইখানার মধ্যে কি রস পাও বলো তো?"

কুণ্ডলী পাকিয়ে একরাশ চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে সুরপতি সুব্রতার দিকে ফিরে হাসে। বলে,—

"বোসো, বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

"রক্ষা কর, আমার বুঝে দরকার নেই। তোমার থিসিস্, এ্যাণ্টিথিসিস্ নিয়ে তুমিই থাকো—"

সুব্রতা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সুরপতি সেদিকে চেয়ে একটু হেসে আবার বইয়ে মনোনিবেশ করে।

ছোট ছোট স্মৃতির তরঙ্গ ধাক্কা দেয় মনে। মনে পড়ে চিঠির আরও কয়েকটি লাইন,—

"রমেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে চল্‌লাম পশ্চিমের পথে। বাকি জীবন এঁর সঙ্গেই কাটিয়ে দেবো।" মনে পড়ে,—

"তোমার কাছে আমার মূল্য কতটুকু? ঝড়ে-উড়ে-আসা ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রো আমি—"

দিগন্ত রেখায় একটি তারা ধীরে ধীরে পাণ্ডুর হ'য়ে যাচ্ছে।

রামপ্রসাদী সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলেছে জগা পাগলা! অমন সে প্রত্যহই যায়। ভিক্ষার ঝুলিটি ঝুলছে কাঁধে, হাতে একখানি ভাঙা বেহালা, তারগুলি বাঁধা বেসুরে।

একদল মাড়োয়ারী গঙ্গাস্নান সেরে ফিরছে ভৈরবের স্তোত্র পাঠ করতে করতে। প্রত্যুষের স্তব্ধতায় মিলিত কণ্ঠের স্তোত্রপাঠে শরীর শিউরে ওঠে।

দূর থেকে ধানকলের ভোঁ ভেসে আসে কানে। একতার নিষ্ঠুর আহ্বান।

কতকগুলি কাক বিশ্রীভাবে কলরব ক'রে ওঠে।

মূল সুরটি ধ'রে পাশের বাড়ীতে সানাই ওঠে বেজে। ভৈরবী রাগিণী। বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুর ফুলে ফুলে ফেনিয়ে ওঠে। ছোট ছোট সুরতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। গতরাত্রির বাসর গেল ভেঙে।

একখণ্ড মেঘের আড়াল দিয়ে ভোরের সূর্য্যকিরণ ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে ষ্টীমারের সার্চ্চলাইটের মতো।

মিউনিসিপালিটির ময়লাফেলা গাড়ীতে স্তূপীকৃত হ'ল ডাষ্টবিনের আবর্জ্জনা। শীর্ণ, হাড়সার ঘোড়াটি পথের উপর খুর ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে বেরিয়ে গেল। সুরপতি চেয়ে রইল সেদিকে।

অপরিসীম নিঃসঙ্গতা। যন্ত্রের একটানা ঘর্ঘরানির মতো স্ফূর্ত্তিহীন, বৈচিত্র্যহীন জীবনের দিনগুলি কেটে যায়।

বড় পিতলের দাঁড়ে বসে কাকাতুয়াটি কথা কয় অস্পষ্ট, আধ-আধ। স্বরপতি তার উত্তর দেয় মিষ্টি মিষ্টি! স্বরপতির বর্ত্তমান জীবনের একমাত্র সঙ্গী এই কাকাতুয়াটি। পাখীটিকে যত্ন ক'রে খাওয়ায়, স্নান করায়, তার সঙ্গে নানারকম কথা বলে। অর্থহীন কথা। কাকাতুয়ার কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয় না। মাঝে মাঝে বিরক্ত হ'য়ে ঝুঁটি নেড়ে চেঁচিয়ে ওঠে,—

"কিয়া—কিয়া—কা—কা—উ—ক—ক—কিয়া—"

স্বরপতি খুব জোরে দাঁড়টি দুলিয়ে দিয়ে হতাশ হ'য়ে চেয়ারের হাতল ধ'রে বসে পড়ে। একটি চুরুট ধরায়। চুরুটের ধোঁয়ায় আব্ছা ভেসে ওঠে চোখের সামনে অসংখ্য অসংলগ্ন চিন্তার মিছিল। কত দিনের, জীবনের কত তুচ্ছ দিনের টুক্‌রো টুক্‌রো স্মৃতি স্বরপতির চোখের সামনে দিয়ে ভেসে চলে যায় ছায়াছবির মতো। কাকাতুয়াটি স্বরপতির দিকে চেয়ে ঝুঁটি নাড়তে থাকে। স্বরপতিও চেয়ে থাকে তার দিকে। তপোবনের মত স্নিগ্ধ নির্লিপ্ত দৃষ্টি। যেন প্রাচীন যুগের কত রহস্যময় ইতিহাস ধ্যানমগ্ন যোগীর মত তার ভিতর স্তব্ধ হ'য়ে আছে।

নক্ষত্রের মতো ছোট্ট একটি মেয়ে। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল হাওয়ায় উড়ছে। সাজি হাতে ফুল তুলছে বাগানে। পূজার ফুল। ন'বছরের স্বব্রতা। স্বরপতিকে পিছনে দেখে ছুটে গিয়ে লুকালো হাস্‌নুহানার পাতার আড়ালে।

রাজবন্দী স্বরপতি মুক্তি পেয়েছে চার বছর পর। হজরতগঞ্জ বোমার মামলার আসামীর মধ্যে সেই ছিল সব চেয়ে তরুণ। জেলখানার গেটের সামনে ছোট্ট একটু জনতা। জনতার ভিতর থেকে একটি কিশোরী বালিকা

বেরিয়ে এসে তার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে গলায় পরিয়ে দিলে যুঁইফুলের মালা।

স্নব্রতার সেই যূথিকাশুভ্র মূর্ত্তি এখন ধূসর স্বপ্নের মতো।

বিস্মৃতি যখন মানুষের কাম্য হয়, তখন স্মৃতি তাকে জড়িয়ে ধরে সাপের মতো। কাকাতুয়াটিকে নামিয়ে স্নরপতি তাকে যত্ন ক'রে খাওয়ায়, কথা বলে। বলে, "বল—ক্রতো স্মর ক্নতং স্মর—"

"ক—কিয়াশ্—টাকিয়া কা—"

কাকাতুয়ার কথা অস্পষ্ট তবু ভাল লাগে।

কিছুক্ষণ এমনি ভাবে কাটে, তারপর স্নরপতি বিছানার উপর ক্লান্ত শরীর দেয় এলিয়ে। ধীরে ধীরে চোখের পাতাতুটি বুজে আসে।

সেদিন মূষলধারে বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। ঘন ঘন বিত্যুতের ঝলক্, মেঘ-গর্জ্জন। স্নরপতির মন আজ অন্তর্মুখী। কাকাতুয়ার ডাক আজ আর ভাল লাগে না, তবু কাকাতুয়া ডাকছে, তার কণ্ঠস্বরে আজ তীক্ষ্ণতা।

নিশুতি রাত্রি ঝিম্ ঝিম্ করে দ্বিপ্রহরের শ্মশানের মতো।

মুখ থেকে সত্তঃনিঃস্থত চুরুটের ধোঁয়ার দিকে চেয়ে স্নরপতি দেখছিলো তার ক্রমবিলীয়মান রূপ।

সবুজ রঙের শাড়ী পরে' পা টিপে টিপে এসে কে যেন তার চেয়ারের পিছন থেকে বল্‌লে—

"ওগো ঘুমোও—ঘুমোও, আর রাত জেগো না—ঘুমও কি তোমায় বশ করতে পারলে না—"

"না—না—না—"

স্থরপতি চেয়ার ছেড়ে ধড়ফড় ক'রে উঠে পড়ে। কাকাতুয়ার ঝুঁটি ধ'রে খুব জোরে জোরে নাড়া দেয়, চুরুট টানে আর ঘন ঘন পায়চারি করে। তারপর চুপ ক'রে চোখ বুজে চেয়ারে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

কাকাতুয়াটি ঘন ঘন চীৎকার করতে থাকে।

স্থরপতি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে দাঁড় থেকে কাকাতুয়াটিকে মেজের উপর নামায়। শৃঙ্খলমুক্ত কাকাতুয়া আনন্দে ককিয়ে ওঠে। ডেস্ক থেকে একখানি ছুরি বার ক'রে স্থরপতি কাকাতুয়ার কণ্ঠনালী চিরে ছেড়ে দেয়। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোয়। মেজের উপর ডানা ঝাপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে এক কোণে গিয়ে কাকাতুয়াটি দু'বার সমস্ত শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে নিস্পন্দ হ'য়ে যায়।

নিশুতি রাতে মৃত কাকাতুয়াটিকে স্থরপতি ফেলে দিয়ে আসে ডাষ্টবিনের আবর্জ্জনার মধ্যে। পরদিন ভোরে মিউনিসিপালিটির ময়লা-ফেলা গাড়ী ডাষ্টবিন্ উজাড় ক'রে আবর্জ্জনার সঙ্গে কাকাতুয়াটিকে নিয়ে চলে যায়।

ঝাড়ুদার রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ভোরের অস্পষ্ট আলো। আজও ঠিক তেমনি ভাবে গাড়ীতে ডাষ্টবিনের আবর্জ্জনা ভর্ত্তি ক'রে শীর্ণ ঘোড়াটি খুব ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে বেরিয়ে গেল। স্থরপতির প্রিয় 'পার্ল' রইল পড়ে। মুখ বিকৃত ক'রে নিষ্পলক চোখদু'টি মেলে সে পড়ে রয়েছে ডাষ্টবিনের মধ্যে।

কিছুক্ষণ পরে একটি ধাঙড় ঠেলা গাড়ীতে ক'রে তাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। স্থরপতি একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেদিকে।

"পার্ল !"

পার্ল ছুটে এসে চেয়ারের হাতলের উপর ঠ্যাঙ্ দুটি তুলে দিয়ে দাঁড়ায়, ঘন ঘন লেজ নাড়তে থাকে। সুরপতি তাকে প্যাট্ ক'রতে ক'রতে বলে, "ফ্রি উইল্ বুঝিস্ পার্ল ?"

পার্ল গোঁ গোঁ করে।

কাকাতুয়াটিকে হত্যা করার পর ভীষণ নির্জ্জনতার মাঝখানে সুরপতির বহুদিন কেটে গিয়েছে। তখন দিবারাত্রি সে দর্শনের মধ্যে ডুবে থাকতো। একদিন বেড়িয়ে ঘরে ফিরতে সে দেখে বহুদূর থেকে একটি কুকুর তার পিছন পিছন দৌড়ে আসছে। অনেকবার সে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু তবু সে তার পিছু ছাড়েনি। ঘরে ফিরে দেখে কুকুরটিও তার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে।

সেদিনের মতো সে তাকে বাইরের বারান্দায় আশ্রয় দিয়েছিল, ভেবেছিল ভোর হ'লে বোধহয় সে স্বস্থানে প্রস্থান করবে। কিছু সে খায় নি। সুরপতিকে দেখে পরদিন ভোরে করুণভাবে চেয়ে রইল তার দিকে। সেদিন থেকে সে হ'ল সুরপতির সাথী, নাম রইল তার 'পার্ল'। কিন্তু আগুনের বুকে খড়ের আয়ু কতক্ষণ।

পার্লকে সঙ্গে নিয়ে সুরপতি প্রায়ই বেড়াতে যেতো। সেদিন পার্ল পথে ভীষণ বিরক্ত ক'রেছে। ছুটে গিয়ে অন্য কুকুরের সঙ্গে করেছে ঝগড়া, কারো পিছন পিছন গেছে ছুটে—সারা পথ ঘাস আর কাঁকর শুঁকে শুঁকে দৌড়ে বেড়িয়েছে। সুরপতি তাকে শাসন করতে গিয়ে যৎপরোনাস্তি হয়রাণ হয়েছে। ঘরে ঢুকে দৌড়ে এক লাফে টেবিলের উপর উঠে পার্ল ভাঙলো একটি কাচের

জার। একখানি বই কামড়ে ধ'রে মেজের উপর খেলা ক'রতে লাগলো। বইয়ের ছেঁড়া পাতাগুলি উড়ে উড়ে যায় আর পার্ল লাফ দিয়ে দিয়ে ধরে।

পার্লএর গলায় শিকল পরিয়ে স্থরপতি ভীষণ চাবুক মার্তে থাকে। শঙ্কর মাছের চাবুক গায়ে কেটে কেটে বসে যায়। পার্ল বিকটভাবে গোঁঙায়, তাতেও হয় না। অসহ্য বিরক্তিতে স্থরপতি বগ্‌লস্‌টি চেপে ধ'রে আঁটতে থাকে। ধীরে ধীরে পার্ল-এর জড়িত গোঙানি ক্ষীণ হ'য়ে আসে। ঠ্যাঙ্ দু'টি সটান ক'রে পার্ল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

অন্ধকারের পটভূমিকায় অশরীরী স্মৃতির মূকাভিনয়।

ঘরের ভিতর পা দিলেই স্থরপতি শুনতে পায় রমেশ ও স্থব্রতার খিল্ খিল্ অট্টহাসি, কাকাতুয়ার ডানা ঝাপটানি, মুমূর্ষু পার্ল-এর গোঙানি। স্থব্রতার একটি কথা শুধু মাঝে মাঝে মনে পড়েঃ

"তোমার মতো স্বামী সত্যিই দেবতা, পূজার যোগ্য—আমাদের ঘর করতে হ'লে দরকার মানুষ—"

এখন স্থরপতির জীবনের ধারা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। সহরের এক কোণে একটি নির্জ্জন রেস্তোরাঁয় গ্লাসের পর গ্লাস মদ উজাড় ক'রে টলতে টলতে ঘরে ফিরে স্থরপতি শুয়ে পড়ে। জীবনের অতীত দিনগুলি দেয়ালের গায়ে, সিলিঙের উপর প্রেতনৃত্য করে।

নির্জ্জন অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে স্মৃতির সর্পিল পথের উপর দিয়ে বহুদূর সে চলে যায়—ফিরে আসার কথা স্মরণ থাকে না। ঘরের ঠিকানা বুঝি গরমিল হ'য়ে যায়।

দিনরাত বুকের হাড়পাঁজর কে যেন রোলার দিয়ে পিষছে। পৃথিবীর সে শ্যামলতা আর নেই, সেই সবুজ রঙের পৃথিবী, সেই প্রশ্নাতুর দৃষ্টি আর নেই পৃথিবীর চোখে, এখন সেখানে ঘন কালিমার প্রলেপ, নিষ্প্রভ ঘোলাটে তার দৃষ্টি।

হায় রে পৃথিবী !

চিরপ্রবহমাণা পৃথিবী ! বিরামহীন গতিতে চলেছে, বিসর্পিল চক্রগতিতে পতন অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ দিয়ে, বিবর্ত্তন আবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে। মিথ্যে, সব মিথ্যে ! স্থরপতির মনে হয় সব অর্থহীন। কোথায় সেই দ্বন্দ্ব, সেই বিরোধ, সেই সমন্বয়। শুধু সহজ সাবলীল একঘেয়েমি। যেন কোন কারখানার কলের ভোঁ অনাদি কাল ধ'রে অহরহ বাজছে। বিরাম নেই।

স্থরপতির অট্টহাসিতে কাচের শিশিবোতলগুলি ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠ্‌লো।

গাছের তামাটে পাতায়, চিলে কোঠার ছাদে, দূরে লৌহকারখানার ধূমায়িত চিমনির মাথায় ভোরের সোনালি সূর্য্যকিরণ ঘোলাটে দেখায়। কোনো স্থদূর পল্লীতে, নবজাত দোদুল্যমান ধানশীষের মাথার উপর হয়তো আলপনা আঁকছে এই সোনালি সূর্য্যকিরণ। তাতে তার কি ?

স্থরপতি ঘরের দরজা দিয়ে বাইরের বারান্দার উপর রেলিঙে কনুই ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ায়। সামনে রায় বাহাদুরের বাড়ী। দোতলার বারান্দায় আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে বসে তিনি একখানি খবরের কাগজ পড়ছেন। সমস্ত বাড়ীটি লাল নীল আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। তেতালার ছাদে রঙ্গিন সামিয়ানা টাঙানো, নীচে ব্যাগপাইপপার্টির বাদকেরা সারবন্দি হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। রায়বাহাদুরের স্ত্রী সোনালি কারুকাজ করা একখানি ভায়লেট্ রঙের শাড়ী প'রে ছ'মাসের শিশুটিকে কোলে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে কি

বললেন। রায়বাহাদুর মহাশয় স্ত্রীর দিকে ফিরে হেসে হাতদুটি বাড়িয়ে দিলেন। মায়ের গলা জড়িয়ে শিশু কেঁদে উঠলো। বহু সাধ্যসাধনার পর বুড়োবয়সে একটি পুত্রসন্তান হয়েছে, আজ তার অন্নপ্রাশন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে মহাসমারোহে।

সুরপতি রাস্তার ধারের জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো।

ব্যস্তবাগীশ জনতার স্রোত। ট্রাফিকের শব্দ।

পাশের বাড়ীর চাকর এক ঝুড়ি আবর্জ্জনা ফেলে গেল ডাষ্টবিনে।

কোনো বিস্ফোরণ নেই, কোনো উল্লম্ফন নেই, পথ বন্ধুর নয়, বেশ মসৃণ। অপরিবর্ত্তনশীল জগৎ।

সেদিন ঘরে ফিরতে সুরপতির অনেক রাত হয়েছিল।

গভীর রাত্রি। পথ জনমানবহীন। দু'একখানি ট্যাক্সি ও রিক্সা মাঝে মাঝে চলাচল করছে। ফুটপাতের উপর মজুরের দল চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে ঘুমুচ্ছে।

সুরপতি ঘুরতে ঘুরতে বাসার কাছে সরু গলিটার ভিতর ঢুকলো। মিট্ মিট্ ক'রে গ্যাসগুলি জ্বলছে। কার বাড়ীর বাগান থেকে হাস্নুহানার মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। অদূরে একটি বীভৎস মূর্ত্তি দেখে সুরপতি হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালো।

ডাষ্টবিন্ থেকে হাত পঁচিশ দূরে নর্দ্দমার ধারে একটি মেয়েমানুষ উলঙ্গ হ'য়ে শুয়ে রয়েছে। চুলগুলি কাদামাটি-মাখা। পরণের শতছিন্ন ময়লা কাপড়খানি নর্দ্দমার ধারে লুটোচ্ছে। একটি লোমহীন নেড়ী কুকুর তার রুক্ষ চুলের গোছা শুঁকছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

সুরপতি কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো তার দিকে। তারপর চুপ ক'রে ফিরে গেল নিজের ঘরে। গ্যাসের অস্পষ্ট আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে সেই বীভৎস নগ্ন নারীমূর্ত্তি। কি কুৎসিত এই নগ্নতা!

হয়তো কোনো সুদূর প্রবাসে দ্বিতল বাড়ীর এক অন্ধকার কক্ষে এখনও রমেশ ও সুব্রতা জেগে আছে—হয়তো—

সুরপতির হাত পা মাথা ঝিন্ ঝিন্ ক'রে ওঠে। বিছানায় শুয়ে সারারাত্রি ছটফট্ ক'রে কেটে যায়। ঘুম আসে না।

ভোরের আলো টেবিলের উপর এসে পড়েছে। সুরপতি উঠে অভ্যাসমতো তাড়াতাড়ি জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

ডাষ্টবিনের পাশে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে। হু হু ক'রে লোক জড় হচ্ছে কোত্থেকে, প্রভাতের জনবিরল পথটি মুহূর্ত্তে সরগরম হ'য়ে উঠলো। জনতার ভিতর তিনচারটি পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। দূরে মিউনিসিপালিটির ময়লাফেলা গাড়ীর সেই শীর্ণ পাঁজরা-বার-করা ঘোড়াটি ধুঁকছে আর খুর ঠুকছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

সুরপতি নীচে নেমে এসে দেখলো ডাষ্টবিনের মধ্যে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় জড়ানো ছোট্ট একটি রক্তমাংসের পুতুল। যেন এক চাঁই জমাট-বাঁধা তাজা রক্ত। জবাফুলের মতো লাল টুকটুক করছে। চোখদুটি অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত, সরু সরু হাতপাগুলি লিক্ লিক্ করছে কাঠির মতো। ভিড়ের ভিতর থেকে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করছেন।

সুরপতি সারাদিন অনুসন্ধান ক'রেও গত রাত্রির সেই মেয়েমানুষটির কোনো খোঁজ পায়নি সেদিন।

এরপর প্রায় ছ'মাস স্বরপতি ঐ ঘরটিতেই ছিল। মাঝে মাঝে সে দেখতো সেই মেয়েমানুষটিকে। কোমরে ছেঁড়া একফালি কাপড় জড়ানো, চুলগুলি আলুথালু উড়ছে। ডাষ্টবিনের কাছে এসে সে মুঠো মুঠো ছাই তুলে নিয়ে জোরে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতো আর চীৎকার ক'রে বলতো—

"ধরে নিয়ে আয়—খুন্ করবো—খুন্—করবো—খুন্ ক'রে ফেলবো—", এর সঙ্গে আরও অশ্রাব্য অনেক কিছু কুকথা।

কিন্তু এই সময়ের ভিতর সে জগা পাগলাকে কোনোদিন কোথাও দেখতে পায় নি। জগা পাগলা কোথায় অন্তর্ধান করেছে। কেউ তার কোনো খোঁজখবর রাখে না।

ঘরের মেজেতে স্বরপতি চুরুট টানে, আর জোরে জোরে পায়চারী করে। মনে পড়ে—জীবনের এক স্বপ্ন-রঙ্গীন সন্ধ্যায় সুব্রতা এসে দাঁড়িয়েছিল তার সামনে, হাতে শুকনো কলার পাতায় মোড়া পিস্তল, ফ্যাকাসে মুখ—বন্দিনী মায়ের মুক্ত-মূর্ত্তি—প্রিয়া নয়।

হেসে উঠলো স্বরপতি—জগা পাগলাও মানুষ! হাঃ, হাঃ! অর্থহীন। ল্যাবোরেটরীর শিশি বোতল গুলো খিল্ খিল্ কোরে হেসে উঠলো—

১৯৩৬

মা

আমি কখনও অন্যায় করি নি, আমি নিরপরাধ।

প্রতারক! খানা-টেবিলে ব'সে তোমার প্রিয়জনের সঙ্গে খেতে খেতে রাস্তার ধারে ফুটপাথের ওপর কোন ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুকের দিকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তুমি ফিরে চাও নি কোনোদিন? ড্রেনের পাশে উচ্ছিষ্ট জড়ো ক'রে বুভুক্ষু পাগল যখন গোগ্রাসে গিলতে গিলতে তোমার দিকে লাল চোখ দু'টো তুলে জিভ বার ক'রে হাত বাড়িয়েছে, তখন তুমি হাল্কা কথার হাসিতে তাকে উপেক্ষা কর নি? চোর ভাল। খুনীকে একশোবার ক্ষমা করা যায়। কিন্তু তোমাকে ক্ষমা করবে কে?—

মা বললেন, বাবা, মুখ অন্ধকার ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে কি করবি বল, তাই না হয় কর, শহরে গিয়েই দেখ না হয়, যদি হাতের কাজকর্ম শিখতে পারিস।

দুদিন পরে যথাসময়ে শুভলগ্নে জীবনের জয়যাত্রাপথে বেরিয়ে পড়লাম। পথ চলতে পিছন ফিরে চেয়ে দেখলাম, মা খিড়কির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন।

গ্রামের রিক্ততায় দারিদ্র্যের যে মৌনগম্ভীর রূপ দেখেছি এতদিন, আজ শহরের মাঝখানে দেখলাম তার মুখর জীবন্ত শ্রী। পল্লীর ধ্যানমগ্ন যোগীকে শহরের মসৃণ রাজপথের ওপর সদম্ভে দাঁড়িয়ে রক্তচক্ষু ললাটে তুলে আগ্নেয় ভাষায় অভিসম্পাত করতে আজ এই প্রথম দেখলাম।

সন্ধ্যার কিছু আগে স্টেশন থেকে নেমে শহরের পথ ধ'রে চলেছি। জনাকীর্ণ পথে নানারকম যানবাহনের ভিড়। কিছুদূর যেতেই দেখলাম, এক জায়গায় একটি বিরাট জনতা, প্রত্যেকের হাতে একটি ক'রে লাল পতাকা। শুনলাম, কুলীদের সভা হ'চ্ছে। মাঝে মাঝে সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠছে, তাদের ভাষা প্রথমে বুঝতে পারি নি।

আর একটু এগিয়ে গিয়ে প্রশস্ত রাজপথের এক পাশে দেখলাম ছোট্ট একটু জনতা। ভিড়ের ভিতর থেকে ভয়ে ভয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, চকচকে গোলাপী রঙের প্রায় দশ ফিট লম্বা একখানা মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে আর একটু দূরে কাঠের একটি দ্বিচক্রযান দলা পাকিয়ে প'ড়ে রয়েছে। মোটরের চাকার পাশে ময়লা কাপড় পরা, ছেঁড়া ফতুয়া গায়ে একটি লোক হাত পা সিঁটকে শুয়ে আছে। কয়েকজন পথিক ভদ্রলোক তার মাথায় মুখে জল দিচ্ছেন।

পরে শুনলাম, ঐ দলা-পাকানো ত্রিচক্রযানটির নাম রিক্‌শ এবং এই শ্রেণীর মানুষ যারা এর ভিতরে যাত্রী বসিয়ে টেনে নিয়ে বেড়ায়, তাদের বলে রিক্‌শওয়ালা।

মাথার উপরে একটা কি অদ্ভুত জীব গোঁ গোঁ ক'রে উঠলো। চেয়ে দেখি, বহুদূরে সাদা বকের মতো ডানা মেলে কি যেন উড়ে চলেছে আর একটু একটু ধোঁয়া ছাড়ছে।

কিছুদূর যেতে যেতে পাশে কচি গলার গান শুনতে পেলাম। ফিরে দেখি, একজন অর্দ্ধনগ্ন স্ত্রীলোকের কাঁকে একটি শিশু, পিঠে পুঁটলিতে আর একটি ঝুলছে, আর তাকে ঘিরে আরও চারটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সমস্বরে গান ক'রে ভিক্ষা করছে।

ওদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিলাম, গলার স্বর ক্ষীণ হ'লেও বেশ মিষ্টি লাগছিল গান। পিছন দিকে কি একটা জোরে ক্যাঁচ করে শব্দ হতে ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে আশপাশে চেয়ে দেখছি, এমন সময় কোটপ্যাণ্ট পরা লম্বা একজন বাবু মুখে একটা বাঁকানো নল দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সামনে এসে কি দুর্ব্বোধ্য ভাষায় বকাবকি ক'রে আমার গালে সজোরে এক চড় মেরে আঙুল দিয়ে ফুটপাথ দেখিয়ে দিলেন। তাঁর আঙুলের আংটির পাথরটি রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোয় প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে পড়ল। তারপর তিনি মোটরে উঠে সোজা চ'লে গেলেন।

এই আমার শহরে আসার প্রথম দিনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এর মধ্যে অতিরঞ্জিত কিছু নেই। প্রথম দিনের অনভ্যস্ত দৃষ্টি দিয়ে শহরের যে মূর্ত্তি আমি দেখেছিলাম, আজও সেই মূর্ত্তি আমার মনে নিখুঁতভাবে আঁকা রয়েছে।

প্রায় মাস তিনেক পরে মাকে চিঠি লিখলাম—

"তুমি শহরে আসতে বলেছিলে, এসেছি। পথে পথে অনেক ঘুরেছি, অনেক চেষ্টা করেছি, কিছুই করতে পারি নি। আমার ভাল লাগে না। আবার তোমার কাছে গ্রামে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। এখানে থাকি বস্তিতে। বস্তি কি, তুমি বোধ হয় জান না। এখানকার বস্তির তুলনায়, মা, তোমার কুঁড়েঘরও রাজার বাড়ি। হুসেনদের মুর্গীর খোপের মতো বস্তির ঘরগুলো। এইরকম একটা ঘরে আমরা চারজন থাকি। একজন গাড়ি টানে, একজন মোটরের মিস্ত্রী, আমি আর একজন নতুন এসেছে।"

গ্রামে ফেরা আর হয়ে ওঠে নি। তারপর তিনি বছর কেটে গেল, কিন্তু গ্রামে ফেরা হ'ল না। এখন আমার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। এক লোহার কারখানাতে কাজ করি, সাপ্তাহিক বেতন দু টাকা সাড়ে ন আনা।

অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে আমরা সকলে সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়িয়ে হাতুড়ি পিটি। বড় বড় উত্তপ্ত লাল লৌহখণ্ড মাথার ওপরে আশেপাশে চলাফেরা করে। আগুনের তাতে গায়ের চামড়া পুড়ে ঝলসে যায়! হাপরের মতো হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে আমরা সকলে শ্বাসপ্রশ্বাস টানি।

আমাদের এই দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনার কোনো মাধুর্য্য নেই। যেমন বৈচিত্র্যহীন, তেমনই একঘেয়ে এই জীবন।

তিন বছর পরে অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে তিন দিনের অবসর পেলাম গ্রামে ফেরবার।

তিন বছর পরে গ্রামে ফিরলাম। আমাদের ঘরখানা ছিল জনমানবহীন পল্লীর এক কোণে। কতকগুলো ঘুণ-ধরা বাঁশ আর মাটির ধ্বংসস্তূপ ছাড়া

আর কিছুই আমাদের নিজের বলতে ছিল না। চালে খড় নেই, মাটির দেওয়াল ধ'সে গেছে, পাশের পুকুরটাও কচুরিপানা আর শ্যাওলাদামে ভরা। বাড়ির চারিদিকে বনজঙ্গল।

মরুভূমির মতো ফসলক্ষেত ধূ ধূ করে চারিদিকে। মাঠ আছে, ফসল নেই। মাঠে মাঠে আজ তৃষ্ণায় আতুর মাটি কাঁদে, আর ভাঙা লাঙলের মাথায় ব'সে চাষারা কাঁদে। পাথরমাটির বুক চিরে চিরে লাঙল গেছে ভেঙে।

নিরিবিলি ভাল লাগলেও ঘরে ফিরে বিরক্তিপূর্ণ মনে দিন কাটাতাম আমি। আমার সব সময়েই মনে হ'ত, দারিদ্র্য যেন আমাদের হাড়-সার বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসেছে, ঘুমের ঘোরে বোবায় ধরার মতো।

প্রথম রাতে ঘরেই শুয়ে রইলাম। ঘুম আসে, আবার ঘুম ভেঙে যায়। যতবার ঘুম ভাঙে, চোখ মেলে দেখি, মা বিছানা ছেড়ে উঠে ব'সে আছেন। ঘরের ভিতর ভীষণ অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই, তারাও নেই। নিবিড় অন্ধকারের মাঝখানে মার সাদা ফ্যাকাশে মুখখানা আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম শুয়ে শুয়ে। কান পেতে চুপ ক'রে শুয়ে রইলাম। ঘুমের ঘোরে আমি যাকে শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ব'লে মনে করেছিলাম, তা চাপা কান্নার গোঙানি। চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে চুপ ক'রে শুয়ে রইলাম। কিন্তু তন্দ্রার ঘোরে দেখছিলাম মার সেই ফ্যাকাশে মুখখানা, আর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম সেই চাপা কান্নার শব্দ।

ঘরের ভিতর একা একা জেগে ব'সে মা কাঁদছে, বাইরে অন্ধকারের ভিতর মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মাটি।

পরদিন সকালে ঘরামী লাগিয়ে মণ্ডপের চাল ছেয়ে নিলাম। সেইখানে সময় কাটাবার জন্যে পিঁড়েতে খড় বিছিয়ে চাটাই পেতে নিলাম। প্রায় সব সময়ই আমি এখানে শুয়ে ব'সে নিজের টুকি-টাকি কাজকর্ম্ম করতাম। সামনের বনজঙ্গল, মাঠ, বিল, দূরের গাছপালা, আর গ্রামের চালাঘরের মধ্যে বহুদিন পরে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের যেন আজ খুঁজে পেলাম। প্রতিবেশের রিক্ততার মাঝখান থেকে নিজের মনকে আমি মুক্তি দিতে চেষ্টা করতাম উন্মুক্ত প্রান্তরের আলোবাতাসের মাঝখানে। এই তিন দিন আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে ভুলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারি নি, ব্যর্থ হয়েছি।

এই কদিনই শুধু মনে হয়েছিল, কল্পনার কৃপণতা পাশবিকতার ইন্ধন যুগিয়ে থাকে।

অসুস্থ শরীরে সারাদিন অনাহারে কাটিয়েছি। সন্ধ্যার আগে মার কাছে ক্ষিধের কথা বলতে মা আমার দিকে একবার মুখ তুলে করুণভাবে চাইলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। বিরক্ত হয়ে কোনো কথা না ব'লে আমি চ'লে এলাম। মার ওপর আদৌ সন্তুষ্ট হই নি।

মণ্ডপে গিয়ে আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে চুপ ক'রে শুয়ে রইলাম। কিছুই ভাল লাগছিল না। কিছুক্ষণ পরে কার মৃদু পায়ের শব্দ কানে এল, ফিরে দেখি, মা অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে আসছেন। হাতে একটা গেলাস থেকে ধোঁয়া উঠছে।

মার সেদিনকার অত সুন্দর ও স্বর্গীয় মূর্ত্তি আমি আজও ভুলতে পারি নি। অস্তগামী সূর্য্যের লাল আলো এসে পড়েছে মার মুখের ওপর, মা যেন রক্তমাংসের মানুষ নন ব'লে মনে হ'ল। মার মুখে শিশুর মতো সরল হাসি, চোখে সস্নেহ দৃষ্টি, যেন আমাকে অপ্রত্যাশিত কোনো উপহার দিয়ে বিস্মিত করতে চান।

মার দিকে ফিরে আমি খুব রুক্ষ ভাবেই বললাম, নিরিবিলিতে আমাকে একটু শুয়ে থাকতেও দেবে না?

তারপর মার দিকে আমি আর ফিরে চাই নি। মা ঠিক তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঝন ঝন ক'রে শব্দ হতে দেখলাম, পিঁড়ের ওপর গেলাসটা প'ড়ে গেছে। অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলাম, মা আমার জন্যে গেলাসে ক'রে গরম দুধ এনেছিলেন।

যেখানে দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান নেই, সেখানে গরম দুধ কোথা থেকে এল, সে প্রশ্ন সেদিন মনে জাগে নি।

গভীর রাত্রে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ঘরের ভিতর চুপিসাড়ে ঢুকে দেখি, মা ঠিক তেমনিভাবেই ব'সে ব'সে কাঁদছেন। আজও তিনি ঘুমোন নি।

পরদিন আমাকে ফিরতে হবে, ফিরে এলাম। মার সঙ্গে কোনো কথা কইবার সুযোগ হয় নি।

শহরে ফিরে আসার প্রায় ছ'মাস পরে শুনলাম, ওলাউঠায় গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছে। গ্রামের প্রান্তে আমার ভাঙা কুঁড়েঘর রাত্রের অন্ধকারে প্রেতপুরীর কঙ্কালমূর্ত্তির মতো প'ড়ে রয়েছে। মা নেই।

ছ'বছর পরের কথা।

কারখানার সর্ব্বগ্রাসী আগুনের চুল্লী শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্য্যন্ত শুষে নিয়েছে। ভিতরে শুধু খানকয়েক ফাঁপা হাড়ের বোঝা ব'য়ে ব'য়ে আমি ও আমার সহকর্ম্মীরা শহরের অলিগলিতে ছায়ার মতো ঘুরে-ফিরে বেড়াই। শ্রমশ্রান্ত জীবনের অবসন্ন রাত্রি একটির পর একটি প্রভাত হয়—পাণ্ডুর প্রভাত।

সারাদিনের পর কারখানার ছুটি হ'লে ভারাক্রান্ত পেশী শিথিল করবার উদ্দেশ্যে মদের দোকানে যাই।

এখন আমি পশু। হিংস্র বর্ব্বর পশুপ্রবৃত্তি আমার চোখে-মুখে, চলাফেরায়, হাবভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই নির্লজ্জ নির্ম্মম পাশবিকতাই এখন আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

সাপ্তাহিক বেতন সমস্ত নিঃশেষ ক'রে দিয়ে একদিন শুঁড়ির দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম পথে। সেদিন কিছু খাওয়া হয় নি। সন্ধ্যা হয়েছে। বুকে পেটে যেন দাবানল জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে।

গলির দুপাশে সারি সারি টিনের ঘর। ঘরের বাসিন্দারা সকলে পসারিণী, পণ্য তাদের হাটের মাছ, মাঠের সব্জি বা রঙিন কাচের চুড়ি নয়, বাসী দেহের মাংসস্তূপ। শহরে এদের সঙ্গে হয় আমার শেষ পরিচয়।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাবেষ্টিত যেন কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রেতপুরীর মধ্যে এরা সকলে বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছে—পূজারিণীর দল। লেলিহান হোমানলের মধ্যে আমাদের বিবর্ণ শোণিতের আহুতি দিচ্ছে মহানন্দে।

একজন স্ত্রীলোক এগিয়ে এসে আমার হাত ধ'রে বললে, আমার ঘরে এস। গায়ে তার উগ্র গন্ধ। মুখমণ্ডল বর্ষণশেষের ভাঙা মেঘের মতো কুঞ্চিত।

আমাকে সে তার ঘরে নিয়ে গেল ডেকে। অনাহূত আমন্ত্রণে প্রলুব্ধ হয়ে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো পিছু পিছু তার ঘরে গেলাম। পেটের দিকে হাত দেখিয়ে বললাম, কিছু খেতে দেবে?

একটু হেসে চোখ দু'টো তুলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বোধ হয় ভাবলে, আমি বিদ্রূপ করছি।

কিছুক্ষণ পরে সে এসে দাঁড়াল দরজার সামনে, হাতে একটা গেলাস, মুখে মুচকি-হাসি। অস্পষ্ট দৃষ্টিপথে অসংখ্য অশরীরী স্মৃতির কালো কালো মূর্ত্তি কিলবিল ক'রে উঠল। মনে হ'ল, তীরবেগে আমি যেন কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি।

আমি ভীষণ জোরে চীৎকার ক'রে উঠলাম। কিছুক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান হতে চেয়ে দেখি, ঘরে ভিড়, হল্লা চলছে। চারিদিক থেকে একটা কথাই শুধু কানে ভেসে এল, সকলে বলছে, আমি নাকি খুব মাতাল হয়েছি।

মাতাল হ'লেও দেখলাম, আমার আকস্মিক চীৎকারে স্ত্রীলোকটির হাত থেকে গেলাসটি মেঝের ওপর প'ড়ে গুঁড়িয়ে গিয়েছে, আর তার চারদিকে যা ছড়িয়ে রয়েছে তা গরম দুধ নয়, উগ্রগন্ধি মদ।

১৯৩৯

কসাইখানা

আরাম প্রিয় নাগরিক তখন ঘুমে অচেতন।

মোহনচাঁদের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার প্রথম জাগরণের ভোঁ নিঝুম বস্তিটিকে ঝাকুনি দিয়ে জাগিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বস্তিটা চলাফেরায়, কথা-বার্ত্তায়, কচি শিশুদের অকস্মাৎ ঘুম ভাঙার কান্নার স্বরে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

বাইরের ধোঁয়াটে আবহাওয়া ভেদ ক'রে ভোরের আলো বস্তীর কুঠ্‌রীতে তখনও পৌঁছায়নি।

লক্ষ্মী কোলের দশমাসের সপ্তম শিশুকে স্তন্যপান করাতে করাতে সান্‌কিতে রুটি সাজাচ্ছিল। দশমাসের শিশু অক্লান্ত শোষণ করেও দুধের বদলে স্তন থেকে ঠাণ্ডা চামড়ার আস্বাদ ভিন্ন কিছু পায় না, কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে।

দূরে কসাইখানা থেকে জবাই-প্রস্তুত পশুদের কম্পমান ক্ষীণ রব কাণে ভেসে আসে।

লক্ষ্মী কোলের শিশুটির মুখে চোখে ঘন ঘন চুমু খেয়ে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে। শিশুর কান্না থামে না। বুকভরা স্নেহে দশমাসের শিশুরও ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। ডুক্‌রে ডুক্‌রে সে কেঁদে ওঠে আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট কচি হাত দু'খানা মুঠো ক'রে পেট্‌টা কুচ্‌কে হাঁটু দু'টো বুক পর্য্যন্ত টেনে এনে চোখ বুজে খুব জোরে চীৎকার ক'রে ওঠে। মনে হয় সে যেন এখুনি তার মায়ের কোল থেকে উঠে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে এর প্রতিবিধান করবে। এ-পৃথিবীর এই দশমাসের অভিজ্ঞতা তার কাছে এত তীব্র মনে হ'য়েছে যে মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তার প্রতিবাদ করেছে। সামান্য একটু দুধ বই তো আর কিছু নয়!

কারও পোষা বেড়ালে দুধ খায়, খাচায় ব'সে সখের পাখীও দুধ খায়। অপর্য্যাপ্ত দুধ। সে কেন দুধ পায় না তবে?

প্রাণপণ জোরে সে তার মায়ের স্তন কামড়ে ধ'রে ছেড়ে দিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে। লক্ষ্মী একবারটি শুধু 'উঃ' ক'রে ওঠে, তারপর কোলের শিশুকে জড়িয়ে ধ'রে আসন্ন শিশুর কথা স্মরণ ক'রে নিজের বুকের দিকে ঘাড় নীচু ক'রে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে।

চেয়ে চেয়ে ভাবে কেন এমন হ'ল! যে-দুধ তার স্তন থেকে অজস্র ধারায় ঝ'রে প'ড়ত রাতদিন, শুধু যে বুকের দুধ খাইয়ে সে অন্য ছ'টি শিশুকে বাঁচিয়ে তুলেছে, সে দুধ গেল কোথায়! বুকের দুধ ছিনিয়ে নেওয়া যায় কি? যায় না বলেই তো সে প্রাণভরে নিজের ক্ষুধার্ত্ত শিশুদের খাইয়ে মানুষ করতে পেরেছে, বুকের দুধ ঝ'রে ঝ'রে কত নষ্ট হ'য়েছে। আজ তার সম্বল মাত্র কয়েক ফোঁটা

শরীরের রক্ত, কচি শিশুর দুধে দাঁত আর চিকণ জিবের টানাটানিতে সে-টুকুর নিঃসরণ কেমন ক'রে সম্ভব হবে। কিন্তু সে টুকুও যদি তার নিপীত স্তনাগ্রে এসে পৌঁছয় তাতেও তার এতটুকু দুঃখ নেই। কিন্তু রক্ত যে! রক্ত তো আর দুধ নয়! হ'লই বা মায়ের বুকের রক্ত, তবুও সে মানুষের রক্ত। লবণাক্ত রক্ত কি কখন বুভুক্ষু দশমাসের শিশুর কাছে সুস্বাদু লাগে!

দুধ আর রক্ত! কারখানা আর কসাইখানা আর তার মাঝখানে এক বস্তীর কুঠ্‌রীতে ব'সে লক্ষ্মী ভাবে—দুধ আর রক্ত, রং সাদা আর লাল, স্বাদ মিষ্টি আর লোনা—

এ কি কর্‌লে ভগবান! লক্ষ্মী মনে মনে বলে ছোট জান্‌লার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে। কারখানার ধোঁয়ার পুরু আস্তরণে আকাশ তখন ঢাকা।

শিশু আবার ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে। লক্ষ্মী একান্ত নিরুপায় হ'য়ে আঙুল দিয়ে একটুখানি গুড় স্তনাগ্রে মাখিয়ে শিশুর মুখের মধ্যে চেপে ধরে। মিষ্টি আস্বাদ পেয়ে শিশু চক্‌ চক্‌ ক'রে চুকিয়ে চুকিয়ে খায়। সরু সরু পা দু'খানা ঘন ঘন নাড়ে, বুকের ভিতর অঁক্‌ অঁক্‌ শব্দ হ'তে থাকে।

শিশুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে লক্ষ্মীর মনে হয় কিছুদিন আগেকার একটি মুমূর্ষু কুকুর ছানার কথা। সান্‌কির জল মেশানো সক্‌ড়ি চুক্‌ চুক্‌ ক'রে খেতে খেতে কুকুর ছানার ছোট্ট লেজটি নাড়বার ভঙ্গিমা লক্ষ্মীর চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট ভেসে ওঠে।

হঠাৎ ছ'টি সদ্যোজাগ্রত উলঙ্গ শিশুর কলরবে ঘরের ভিতর সরগরম হ'য়ে ওঠে। সকলের মুখে একই বুলি, মার কাছে খাবার কোথায় তার প্রশ্ন।

লাট্টু ছোট্টুর চুল ধ'রে এক টান দিয়ে বল্লে: তুই খাবি কেন? কাল রাতে তুই খেইছিস্।

বেশ করেছি, তোর কি—ব'লে ছোট্টু লাট্টুর পিঠে এক কিল বসিয়ে দিয়ে মায়ের পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়।

রামলাল তখন কারখানার পোষাক প'রে সান্‌কির পাশে এসে বসেছে। ছ'জন বৃত্তাকারে সান্‌কির পাশে ব'সে সাজান রুটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

জটু বল্লে: ছোট্টুকে দিস্‌নে বাবা, ও কাল চুরি করে খেয়েছে। জটুর কথা শেষ হ'তে না হ'তে লাট্টু এক লাফ দিয়ে উঠে ছোট্টুর পিঠটা জোর করে রামলালের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে ক্ষত চিহ্নের উপর আঙ্গুল দেখিয়ে বল্লে: এই যে—

রামলাল লক্ষ্মীর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে: কি হ'য়েছে রে?

লক্ষ্মী বল্লে: লক্ষ্মণের বৌ রুটি ভাজ্‌ছিল—ছোট্টু একখানা রুটি তুলে নিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল, তাই লক্ষ্মণের বৌ সান্‌কি ছুড়ে মেরেছে—

সান্‌কি ছুড়ে মেরেছে? একখানা রুটি নিয়েছে ব'লে? এতবড় আস্পর্দ্ধা লক্ষ্মণের বৌ-এর, ছেলেটা যদি ঘায়ে অঘায়ে লেগে খুন হ'ত?—কথাগুলো শেষ করেই রামলাল সোজা ছোট্টুর গালে সজোরে এক চড় মেরে বল্লে: কুকুরের জাত, যাস্ কেন? যাবি আর?

ছোট্টু কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মার দিকে ফিরে ধমক দিয়ে বলে: তুই তো খেতে দিস্ না—

দু'বছরের পট্টু ছোট্টুর অবস্থা ও রামলালের উগ্রমূর্ত্তি দেখে ভয়ে হাউমাউ ক'রে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌লো: লুতি আমি খাইনি বাবা—

রামলাল আর কোনো কথা না ব'লে সোজা উঠে দাঁড়াল। লক্ষ্মী তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে : খেলে না ?

না—ওদের ভাগ ক'রে দিস্,—ব'লে রামলাল কারখানায় চ'লে গেল।

ছোট্টুর খিদে পেয়েছে, খেতে চেয়েছে, লক্ষ্মী খেতে দেয়নি। তাই যদি সে একখানা রুটি নিয়েই থাকে তাতে ক্ষতি কি ? ছেলেমানুষ, তার কি বুদ্ধি হয়েছে ? লক্ষ্মণের বৌ সেজন্যে তাকে ভাঙা সান্‌কি ছুড়ে' মারলে ! বড় গুমাক্ হ'য়েছে লক্ষ্মণের বৌ-এর।

রামলাল হন্ হন্ করে' কারখানার দিকে হাটতে হাটতে চিন্তা করে। আজ সন্ধ্যায় ফিরে সকলকে ডেকে এর বিচার সে করবেই। এত বড় অহঙ্কার !

রামলালের হঠাৎ মনে পড়ে এক পাগলের কথা। সেদিন সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল—একটি বাড়ীর ফটকের সামনে খুব হট্টগোল শুনতে পায়। উলঙ্গ একটি লোক, মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল, গায়ে ছাই মাটি গাখা, গোলমালের কারণ হ'চ্ছে সে-ই। দু'জন খোট্টা দারোয়ান তাকে জুতোপেটা করছিল আর অশ্রাব্য গালাগালি দিচ্ছিল। হাতদশেক দূরে কয়েকজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। প্রহারের দাপটে লোকটির নাক মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। অপরাধ একখানা কাপড় চুরির। মার খেয়ে লোকটি নর্দ্দমার পাশে শুয়ে শুয়ে ধুকতে লাগল।

রামলাল সেই লোকটিকে প্রায়ই দেখেছে উলঙ্গ হ'য়ে বড় রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্র্যাফিক্ পুলিশের মতো চলন্ত যানবাহনগুলিকে হুকুম করছে,—ইধার্‌সে যাও, উধার্‌সে যাও,—কোনো কোনো মোটরের যাত্রীর কাছে হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে চীৎকার করে' বলছে : জাহান্নমে যাও, বেজন্মার দল—

প্রশস্ত রাজপথ। দু'পাশে বহুলোকের ভিড়। তার কিন্তু কোনো কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। সোজা উলঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার মাঝখানে সে অবিরাম অর্থহীন বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে :

—চাকা ঘুরছে, বন্ বন্ করে' ঘুরছে.—চোখের মাথা খেইছিস বেজন্মার দল ; দেখবি কেন—শাঁকও বেজেছে, হা-হা—! বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ থেমে আকাশের দিকে চেয়ে আবার বলতে থাকে,—ঘোরাও দেখি বাবা—গদাখানা একবার ঘোরাও, মুণ্ডপাত কর,—বেজন্মার দল—।

তারপর পিছনে ট্র্যাফিক পুলিশকে এগিয়ে আসতে দেখে দৌড়ে এক গলির মধ্যে সে অন্তর্দ্ধান করে।

রামলালের চলতে চলতে এই পাগলটির কথা মনে পড়ে আর ভাবে, একখানা ছেঁড়া কাপড়েই তো ওর অভাব মেটে। অথচ কেউই দেয় না এমনি। চাইলে মুচ্‌কি হেসে বলে পাগল, না চেয়ে নিলে চোখ লাল করে' বলে চোর। কেন চাইবে ? চুরি করবে, ডাকাতি করবে, একশবার করবে—

কারখানার দ্বিতীয় ভোঁ আরম্ভ হ'তেই রামলাল চম্‌কে উঠ্‌লো। ভোঁ থামতে না থামতে দৌড়ে সে ফটকের সামনে পৌছে গেল।

এদিকে ছোট্টু তার মাকে ভাগবাটয়ার অবসর না দিয়েই ছোঁ মেরে সান্‌কি থেকে একখানা রুটি আর একটু গুড় নিয়ে ছুটে কসাইখানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। রোজ তার এখানে সকাল সন্ধ্যায় আসা চাই-ই। সকালে একটু চাম্‌ড়া, এক টুক্‌রো হাড় নিয়ে কঙ্কালসার কুকুরগুলোর গজরানি ও কামড়াকামড়ি দেখা, আর সন্ধ্যায় যখন কসাইয়ের দল হর্‌-র্‌-র্‌ শব্দ করতে করতে ভেড়ার পাল নিয়ে কসাইখানার দিকে আসে তখন কম্পমান্ ভেড়ার ভয়ার্ত্ত "ব্যা-আ" রব শোনা ছোট্টুর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ত্তব্য। অনাস্বাদিত

কোন মাদক দ্রব্যের নেশায় যেন ছোট্টু বিভোর হ'য়ে যায়। হতভম্বের মতো নির্ব্বাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে আর শিশুমনে নানারকম কুতূহলী প্রশ্ন জাগে।

কারখানার ভোঁ সকলকে আকাশস্পর্শী স্বরে আহ্বান করে' বলে: আয়! দলে দলে তোরা আয়! জলন্ত চুল্লী তোদের ডাক্‌ছে; বিরাট কলেবর লৌহযন্ত্র বিকট চোয়াল ফাঁক করে' ক্লান্তিহীন খট্ খট্, ঘটাং ঘটাং, ঝুজ্— বিচিত্রস্বরে তোদের ডাকছে; ছেনি, লোহা, হাতুড়ি, হাঁপর, চিম্‌টে, ক্রেন্ তোদের ডাকছে,—আয়!

ধোঁয়ার আস্তরণের ফাঁক দিয়ে রক্তবর্ণ সূর্য্য দেখা যায়, উত্তপ্ত লাল লৌহখণ্ডের মতো, যেন মেঘের লৌহবর্ত্মের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। রক্ত-মাংসের যন্ত্রের দল সেদিকে ফিরে চায় কি না চায়, ঘাড় হেঁট ক'রে দৈনন্দিন কাজের আহ্বানে সাড়া দেয়। দলে দলে সব কারখানার অগ্নিগহ্বরে প্রবেশ করে।

সঙ্গে সঙ্গে যে যার নিজ নিজ বিভাগে সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়ায়। ঘর্ষণে, ঘূর্ণনে, আঘাতে, আবর্ত্তে, আস্ফোটে, শব্দ প্রতিশব্দের মধ্যে ইস্পাতের প্রতিমূর্ত্তিরা সব কাজে লিপ্ত থাকে। আগুনের তাপে রক্ত বাষ্প হ'য়ে যায়। অজস্র ধারায় বুক পিঠের ত্'পাশের শক্ত মাংসস্তূপের পাশ বেয়ে ঘাম ঝরে' পড়ে। অবরুদ্ধ আবহাওয়ায় শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয়। ফুস্‌ফুসের সম্প্রসারণে সকলের প্রশস্ত বক্ষ বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে।

ছুটির ভোঁ সুরু হ'তেই সকলের হাতপা সব অবসন্ন হ'য়ে আসে। স্ফীত শিরা উপশিরা শিথিল হয়। গন্তব্য ষ্টেশনে পৌছে ট্রেনের ইঞ্জিন যেমন জঠরস্থ

বাষ্প ছেড়ে দেয়, তেমনি সকলের বাষ্পাকুল বক্ষ থেকে 'হুস্' ক'রে পাজরবন্দী হাওয়া বেরিয়ে আসে।

ছুটির পরে রামলাল কারখানার বাইরে আস্তেই হামিদ দৌড়তে দৌড়তে এসে তার কাঁধে হাত দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে বল্লে: আমাদের এক আস্তানা আছে, যাবি সেখানে?

কোথায়? রামলাল জিজ্ঞাসা করলে।

"বেশী দূর নয়, কাছেই"।

"কে কে যাবে?"

"আমরা ছ'জন,—আমি, তুই, কিষণ, বিহারী, জমীরউদ্দিন আর আমেদ—"

"মদ খাওয়াস্ তো যাই"—

"বোতল বোতল মদ, কত খাবি তুই? রোজ আমরা পেট ভরে' মদ খাই সেখানে।"

রামলাল আপত্তি করে না, কিন্তু মনে মনে ভাবে পেট ভরে' মদ জোটে কোথা থেকে। হামিদ কোথায় এমন জায়গার সন্ধান পেলে?

যথাস্থানে পৌঁছে রামলালের ভুল ভেঙে যায়। রামলাল দেখে ছোট্ট একটি খোলার ঘর, মেজেতে দু'খানা চাটাই পাতা, মদের বোতল, তাড়ির ভাঁড় কিছুই নেই। অবাক হয়ে রামলাল ঘরের চার কোণে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে দেখে, কিছুই বলতে পারে না।

হামিদ রামলালের কানে কানে বলে: চুপ করে' কথাগুলো শোন, মদ পরে খাবি।

ফিরবার পথে হামিদ জিজ্ঞাসা করে : শুন্‌লি ?

রামলাল জবাব দেয়' 'হুঁ'।

"মদ খাবি ?"

রামলাল জবাব দেয় না। চুপ করে' দু'জনে পথ চলতে থাকে।

রাতে ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর শুয়ে শুয়ে ভাঙ্গা জানালার ফাঁক দিয়ে রামলাল মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। কালো কালো দৈত্যমূর্ত্তিরা দুরন্তবেগে ছুটে চলেছে। নিস্তরঙ্গ আবহাওয়ায় অশান্তি। কারও চোখে ঘুম নেই।

মেঘের পাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝল্‌কায়, রণাঙ্গণে কামান বিস্ফোরণের আলোর মতো। রামলাল ভাবে কোথায় যেন ঝড় উঠেছে। ঝড়ের নিঃশব্দ পদসঞ্চারণ সে শুনতে পায়। প্রকৃতি নিস্তব্ধতার অবগুণ্ঠন খুলে' ফেলে আরণ্যক হিংস্রতায় উন্মুক্ত হ'য়ে অত্মপ্রকাশ করে বুঝি।

লক্ষ্মীর পাশে বসে' কপালে হাত দিয়ে রামলাল বলে : কতদিন মাতাল হ'য়ে তোকে মারধোর করিছি—

লক্ষ্মী কোনো সাড়াশব্দ দেয় না ; চুপ ক'রে মরার মতো নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে থাকে। রামলালের আজ রাত ক'রে ঘরে ফেরাতেই তার সন্দেহ হয়েছে। রামলাল নিশ্চয়ই নেশা করেছে, মদ পায়নি, গাঁজা খেয়েছে।

রামলাল বলে : ছেলেগুলোকে আর লাথিঝাঁটা মারিস্ নি, ওদের দু'টো মিষ্টি কথা বলে' আদর করিস্।—একটু থেমে রামলাল আবার বলতে থাকে, : ওদের বাঁচিয়ে রাখ্ লক্ষ্মী, বাঁচিয়ে রাখ্—

লক্ষ্মী ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে যায়, সমস্ত শরীর হিম হ'য়ে আসে। রামলালের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন তার কাছে অহেতুক ও অবান্তর বলে' মনে হয়। এ তার

পরিবর্ত্তনই নয়। প্রচণ্ড নেশার ঘোরে রামলাল অর্থহীন প্রলাপ বকছে। মাতাল, চণ্ডুখোর, গেঁজেল রামলাল নেশার ঘোরে ভুল বকছে। খুন করবে নাকি!

লক্ষ্মীর মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে' রামলাল বলে: নেশা আর করব না, তোর মাথার কীরে, নেশা আর করব না—

লক্ষ্মীর মনে হ'ল বলে: রেখে দাও তোমার কীরে, ও আমি ঢের শুনিছি,—কিন্তু কথা কটা মুখের কাছে এসে আট্‌কে যায়।

রামলাল বলে: আমরা নাকি ওদের ভাই,—কথা শুন্‌লে অবাক্ হ'য়ে যাবি —ওরা বলে আমরা নাকি চোর নই, ডাকাত নই,—

লক্ষ্মীর মনে হয় জোর গলায় বলে: তা বৈ কি,—তবে কি, জেল খেটে খেটে হাড় তো তোমাদেরই পেকে যায়—

—হামিদ খুনী নয়, লক্ষ্মী,—ল্যাংটা পাগলটা চোর নয়, ছোট্টু চুরি করে নি"—

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে কে যেন রামলালের টুটি টিপে ধরে। বিদ্যুতের আলোয় রামলাল চেয়ে দেখে লক্ষ্মী ঘুমুচ্ছে, ছোট্টু, লাট্টু, পট্টু সব অকাতরে ঘুমুচ্ছে। রামলালের শ্রান্ত দেহ অবশ হ'য়ে আসে।

ঘুমন্ত ছোট্টুর স্বপ্নাচ্ছন্ন সীমাহীন দৃষ্টিপথে অসংখ্য কম্পমান্ মেষ-যূথ চারিদিকে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে ব্যা-অ্যা-অ্যা রবের প্রতিধ্বনি তুলে বিলীয়মান।

আধ-ঘুম আধ-জাগরণের গোধূলি-চেতনায় রামলালের চোখের সুমুখে লক্ষ লক্ষ হামিদের অপচ্ছায়া।

বাইরে স্তূপীকৃত গাঢ় কৃষ্ণমেঘের অবয়ব জুড়ে' আসন্ন ঝড়ের আভাষ।

সকালে লক্ষ্মীর যখন ঘুম ভাঙল তখন সমস্ত শরীর তার এক অদ্ভূত চেতনায় আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে পেট থেকে এক একটা অসহ্য ব্যথা

মোচড় দিয়ে উঠে সর্পিল গতিতে বুক পর্য্যন্ত গিয়ে মেরুদণ্ড বেয়ে কোমর পর্য্যন্ত নেমে আসে। মাথা, হাত পা সব ঝিন্ ঝিন্ করে। শরীর ক্রমেই অবসন্ন হ'য়ে আসে। এ-চেতনার সঙ্গে লক্ষ্মীর পরিচয় আছে, তার আর বুঝতে বাকী থাকে না, চোখের সাম্‌নে সব ঘোলাটে হ'য়ে যায়। ভয়ে মুখের রং পাঁশুটে হয়ে আসে।

গমনোদ্যত রামলালের মুখের দিকে চেয়ে লক্ষ্মী বলে : একটু তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরো, কারখানার ছুটির পর যেও না কোথাও—

রামলাল নির্লিপ্তভাবে জবাব দেয় : না গেলে চল্‌বে না,—এত করে' বলেও তোর বিশ্বাস হ'ল না—দ্রুত পা ফেলে রামলাল ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সারাদিন লক্ষ্মী ঘরে বাইরে ছট্‌ফট্ করে' ঘুরছে। সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত দ্রুত এগিয়ে আসছে। ভয়ে কাঠ হ'য়ে লক্ষ্মী জান্‌লার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কারখানার পথের দিকে চেয়ে থাকে। স্থির হ'তে পারে না, ক্রমেই যন্ত্রণা বাড়ে। ঘরের মেজের উপর লক্ষ্মী অস্বস্তিতে পায়চারি করতে থাকে।

চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে। দলে দলে মজুরেরা ঘরে ফেরে। রাতভোর যাদের কাজ তারা ঘর ছেড়ে কারখানার দিকে যায়।

রামলাল তাহ'লে সত্যিই ফিরল না!

ছেলেগুলোর পেটে কাল থেকে কিছু পড়েনি। খিদের তাড়নায়, তার উপর মায়ের এইরকম হাবভাব দেখে কে কোথায় উধাও হয়েছে ঠিক নেই।

রাত্রি দেড় প্রহর উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। রামলাল এখন ঘরে ফিরল না। লক্ষ্মীর আর সহ্য হয় না।

বুনো শূয়োরের মতো গজরাতে গজরাতে লক্ষ্মী মেজের উপর আছড়ে পড়ে' যন্ত্রণায় মুখ ঘস্‌টাতে থাকে। হাঁটু দু'টো মুড়ে পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে ঘরের এক কোণে দেয়ালের দিকে সরে' সরে' যায়। মাঝে মাঝে গোঙিয়ে ওঠে। দু'হাত দিয়ে পরণের কাপড়খানা শতটুকরা করে' ফেলে। চোখের সামনে বার বার আলো ঝল্‌কে উঠে নিভে যায়। হাত পা লোহার মতো শক্ত করে' টান টান করে ছড়িয়ে দিয়ে 'মাগো' বলে' লক্ষ্মী বীভৎসভাবে আর্ত্তনাদ করে' ওঠে।

আশপাশের কুঠ্‌রী থেকে সকলে ছুটে আসে। রাত্রিশেষে প্রদোষান্ধকারে রামলালের অষ্টম সন্তান হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে ভূমিষ্ঠ হয়। ছোট ছোট পা ও মুষ্টিবদ্ধ হাত দু'খানা নাড়াবার ভঙ্গিমা দেখে মনে হয় যেন এ-পৃথিবীর উপর সে আদৌ সন্তুষ্ট নয়।

ভোর হয়। কারখানার ভোঁ বাজে। লক্ষ্মী চোখ মেলে ঘরের চারিদিকে চেয়ে রামলালকে দেখতে পায় না। হাত বাড়িয়ে কিষণের বৌ-এর কাছ থেকে শিশুটিকে বুকের উপর নিয়ে স্তন্যপান করাতে থাকে।

আজকের দিনে রামলাল কারখানায় গেল কি করে! কাল রাতের মদের নেশা রামলালের কি এখন কাটে নি? গেঁজেল, মাতাল, চণ্ডুখোর রামলালের কথা কি কখন সত্য হয়? রামলাল শপথ করে, বলে, "লক্ষ্মী, তোর মাথার কীরে, নেশা আর আমি করব না—ছেলেগুলোকে বাঁচাস্—"হায়রে কীরে! মাতাল রামলাল প্রলাপ বকেছে। গেঁজেল রামলাল মিথ্যা কথা বলেছে।

সেদিন সকালেই একখানি দৈনিক সংবাদপত্রে গলিত ধবল ও কুষ্ঠের বিজ্ঞাপনের তলায় এককোণে ছোট বর্জ্জাইস্ অক্ষরে ছ'লাইনে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে:

মোহনচাঁদের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায় গতকল্য হঠাৎ ক্রেন ছিঁড়িয়া একটি দুর্ঘটনা ঘটে। তিনজন শ্রমিক আহত হয় এবং কর্তৃপক্ষরা সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিয়া প্রাথমিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। বিষয়টির তদন্ত চলিতেছে। কেহই গুরুতরভাবে আহত হয় নাই বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সব সংবাদ সত্য হয় না। তিনজন নয়, আটজন শ্রমিক আহত হয় এবং যে দু'জন তৎক্ষণাৎ মারা যায় তার মধ্যে রামলাল একজন।

লক্ষ্মীর কথামত রামলাল সেদিন কারখানার ছুটির পর ঘরে ফেরেনি!

শিশুর মুখে চোখে লক্ষ্মী ঘন ঘন চুমু খায়। স্তনমুখে শিশু কচি কচি ঠোঁঠ নাড়ে আর তার প্রশান্ত কপালের দিকে চেয়ে লক্ষ্মী ভাবেঃ বাঁচাস্,—কি ক'রে বাঁচাব—?

ছেলেগুলো সব মাকে ঘিরে বসেছে। পটু মায়ের মাথার কাছে ব'সে এই অদ্ভুত জীবটির নাকে মুখে হাত দিচ্ছে বার বার আর লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করছেঃ ভাই, ভাই, না মা? লুতি খাবে?

ছোট্টু তার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য ভোলেনি। ভোরে সে কসাইখানার পাশে গিয়ে রোজকার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কঙ্কালসার কুকুরগুলোর হাড় আর চামড়া নিয়ে কামড়াকামড়ি দেখছে। গাড়ী বোঝাই জবাই-করা ছাল ছাড়ানো ছাগল ভেড়া বাজারে চলেছে। দুদিন উপবাসী ছোট্টুর জিব দিয়ে লালা ঝরে আর সে মনে মনে ভাবে আজ যত রাতই হোক্ রামলাল ঘরে ফিরলে সে জিজ্ঞাসা করবেঃ কাঁচা হাড় চামড়া খায় না বাবা?

১৯৪০

সূর্য্যপ্রণাম

সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্য্যন্ত একটি রাতের ঘটনা।

অম্বিকার বিয়ের একরকম পাকাপাকিই ঠিক হয়েছে। এক প্রাচীন জমিদার বংশের মেয়ে। বংশে কেউ নেই। মেয়ের এক বৃদ্ধ কাকা শুধু জীবিত আছেন, ভাইঝিকে নিয়ে তিনি গ্রামেই বাস করেন। কাজকর্ম্ম অর্থাৎ জমিদারী তদারক আজকাল আর করেন না, করবার ক্ষমতাও নেই। তবু আশৈশবের স্বভাব এখন তিনি ছাড়তে পারেন নি। সেটাও তেমন কিছু নয়, শিকার আর সঙ্গীত। দিনেরবেলা বন্দুক নিয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে ভৃত্যের সঙ্গে এখনও তিনি বিলে বিলে আর চরে চরে পাখী শিকার করে বেড়ান। সূর্য্যাস্তের

পর ঘরে ফেরেন। কোনদিন শিকার মিললে হয়ত ভাইঝিকে ডাক দিয়ে বলেন: "আজ একটা চখা পড়েছে মা ঘোলপুকুরের পাড়ে। একা একাই উড়ে বেড়াচ্ছিল, চখী বোধ হয় নেই, আর সেই জন্যেই মারলাম। এরকম নিঃসঙ্গ না হ'লে আমি কখন চখা-চখী শিকার করি নে।" "ওরা বুঝি একসঙ্গেই থাকে কাকাবাবু?" ভাইঝি রেণু জিজ্ঞাসা করে। "হ্যাঁ মা, ওরা একসঙ্গেই থাকে, একসঙ্গে এ-বিলে সে-বিলে উড়ে বেড়ায়, কখন ছাড়াছাড়ি হয়না। সেজন্যে ওদের কখন একা ভিন্ন মারতে নেই—।" এই ধরণের একটা কথাবার্ত্তা হয়ত হয়। তারপর ইচ্ছা হ'লে তাঁর স্বর্গীয় পিতার সেতারটি নিয়ে মাঝে মাঝে সুরালাপ করেন, না হয় পুরাতন পিয়ানোটির সামনে বসে মামুলি গৎ বাজান। নাম রমাকান্ত দেব সরকার।

রমাকান্তবাবুর দূর সম্পর্কের এক ভাইপো রণেশ এই বিবাহের উদ্যোক্তা। ঠিক হ'ল অম্বিকা, রণেশ ও তার আর এক বন্ধু অজয়, তিনজনে একদিন পাত্রী দেখতে যাবে। অনেক বাক্-বিতণ্ডার পর বন্ধুদের মধ্যে স্থির হ'ল যে সংবাদ না দিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ এসব ব্যাপারে নাকি হঠাৎ উপস্থিতিই উপভোগ্য। অজয় বল্‌লে: "এমন কি অসুবিধে হবে? স্টেশন থেকে বাস পাওয়া যাবে, বাস থেকে মাইল খানেক পথ, সন্ধ্যার পরই পৌঁছে যাব।" সকলেই সম্মতি জানাল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার কিছু আগে ট্রেণ ছাড়ল। ট্রেণে পূজার ছুটিতে দেশ-বিদেশাভিমুখী যাত্রীদের ভিড়। ঠেলাঠেলি করে' তিনজন তৃতীয় শ্রেণীর কামরার এক কোণে কোনমতে একটু বসবার জায়গা করে' নিল। সঙ্গে জিনিষপত্তরের বিশেষ কিছু উপদ্রব ছিল না। সহযাত্রীদের মধ্যে জন প'চিশ কুলী, এক পাশে

একজন ভদ্রলোক শুয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছেন, হাঁপানি রোগী বোধ হয়, মাথার কাছে বছর ছাব্বিশের একটি যুবক, পায়ের কাছে বছর আঠারোর একটি বিবাহিতা স্ত্রীলোক। সকলেই স্বস্তি ও স্বাস্থ্যের জন্য সহর ছেড়ে দেশে ফিরছেন, না হয় বিদেশে যাচ্ছেন।

কামরায় ভীষণ হট্টগোল কুলীদের। মাঝে মাঝে কেউ ট্রেণের জানালার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে গান ধরছে। সকলেরই খুব স্ফূর্ত্তি। বহুদিন পরে নিজেদের জেলায় ফিরবার ছুটি মিলেছে, স্ফূর্ত্তি হওয়াই স্বাভাবিক।

অম্বিকার প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে উঠল। অথচ প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। করলেই সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জবাব আসবে যে মাশুল সে শুধু একা দেয় নি, তারাও দিয়েছে, অতএব অধিকার সকলের সমান। এ-জবাবের বিশেষ অভিজ্ঞতা অম্বিকার আছে বলেই রণেশ কিছু বলবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হলেও অম্বিকাই বরং তাকে বাধা দিল। অজয় ইতিমধ্যে একটি কুলীর সঙ্গে দিব্যি আলাপ জমিয়েছে। এ-ব্যাপারে সে বিশেষ পটু। অপরিচিত লোক কয়েক মিনিটে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'য়ে যায়, ক্ষণিক মিলনের পর বিচ্ছেদের দৃশ্য বাস্তবিকই করুণ হয়ে ওঠে। সে-দৃশ্য অম্বিকা কয়েকবার অজয়ের সহযাত্রী হ'য়ে স্বচক্ষে দেখেছে।

অম্বিকার স্বভাব আশৈশব অন্তর্মুখী হলেও অজয়ের সরল বহির্মুখী চরিত্র তাকে চিরদিনই আকর্ষণ করেছে। অজয়ের উপর যেমন তার প্রীতি, তেমনি শ্রদ্ধা। ভয়, লজ্জা, মান, অপমান সব কিছুরই বিচারক অজয়ের খেয়াল। সাধারণ জীবনযাপনেই সে অতি সন্তুষ্ট। কোনো উদ্দেশ্য নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, অভিযোগ নেই। জীবন যেন তার কাছে প্রশস্ত পথের সামিল, পরিষ্কার, আবর্জ্জনাশূন্য, নিষ্কণ্টক, এগুলেই হ'ল। রাতের পর রাত সে তার প্রতিবেশীর

ঘরে রোগী সেবা করে, মুমূর্ষু যক্ষ্মারোগীর উদ্গারিত রক্ত দু'হাতে সে নিঃসঙ্কোচে সাফ্ করে, হাসপাতালের বাসি মড়া দাহের জন্য সেই হয় প্রথম উৎসাহী, সার্বজনীন পূজায় সেই করে কর্তৃত্ব, আবার শীতের রাতে পথ চল্‌তে চল্‌তে ফুটপাতে ঘুমন্ত ভিখারীর অনাবৃত দেহ সে নিজের গায়ের চাদর খুলে দিয়ে চুপি চুপি ঢেকে রেখে চলে' যায়। অবশ্য দোষ আছে তার চরিত্রের। একরাত দু'রাত বারাঙ্গনা গৃহেও সে যাপন করে' থাকে, অনেক রাতে মাতাল হ'য়ে ফিরে বৃদ্ধা মা'কে সে গালিগালাজ করে। কিন্তু তবু যেন অজয়কে ভাল না বেসে উপায় নেই। শুধু তাই নয়, তার সাহচর্য্যে সত্যিই শ্রদ্ধায় মন ভরে' ওঠে। অজয়ের কথা মনে হ'লে অম্বিকার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি নদীর ছবি,—এখানে সেখানে বালুর চর, কিন্তু মরা নদী নয়। বর্ষায় নদীর বুকে যখন বান ডাকে তখন কুল ছাপিয়ে জল ওঠে, চর মিলিয়ে যায় জলের তলায়। জীবন্ত নদীকে কখন গ্রীষ্মের উত্তাপজনিত ক্ষণিকের বালুচর দিয়ে বিচার করা যায় না। কুলীর সঙ্গে আলাপরত অজয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে অম্বিকার আজ সেই কথাই মনে হল।

অজয়ের আলাপ বেশ নিবিড় হ'য়ে উঠেছে। রণেশ ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাসে বেশ গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছে। একপাশ থেকে অম্বিকার কানে কয়েকটি কথা স্পষ্ট ভেসে এল: "মর গিয়্যা না বাঁচ গিয়্যা বাবু!"

বক্তার মুখের উপর অম্বিকা দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। অজয়ের নূতন কুলী বন্ধুটি বলছে: "দাওয়াই নেই, ঘরে লোক নেই, একলা বাবু, মরবে না তো কি হবে?"

কাকে উদ্দেশ্য করে' বলা হ'চ্ছে বুঝতে না পেরে অম্বিকা বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে রইল অজয়ের মুখের দিকে। অজয় বলল: "তোমার ছেলেপুলে নেই?"

জবাব এল : "না বাবু, সাদী করে' কল্‌কাত্তা চলে' এনু কামে,—ঘর তো তিন বরষ যাই নি।"

আধা-বাঙ্গলা আধা-পশ্চিমা ভাষার মারফত অম্বিকা বুঝল যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছিল সে আর কেউ নয়, বক্তার স্ত্রী। তার স্ত্রী সম্প্রতি মারা গিয়েছে এবং বিয়ের পর তিন বছরের মধ্যে তার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয় নি। বিয়ের তিন দিন পরেই তাকে দেশ ছেড়ে, সদ্যবিবাহিতা বধুকে ছেড়ে, কাজে বিদেশে আসতে হয়েছে।

কি অদ্ভুত, অম্বিকা ভাবে। স্বচক্ষে সে এই লোকটিকেই কিছুক্ষণ আগে সহকর্ম্মীদের সঙ্গে স্ফূর্ত্তি করতে দেখেছে, চলন্ত ট্রেণের জানলার ফাঁক দিয়ে ধাবমান মাঠ, গাছপালার দিক চেয়ে মুক্তকণ্ঠে গান করতেও শুনেছে। তখন কল্পনা করতেও পারে নি, যে বহুদিন পরে ব্যথাতুর অন্তরে এই লোকটি তার বধূহীন শূন্য-ঘরে ফিরে যাচ্ছে। অম্বিকা মনে মনে ভাবে কি-ই বা আমরা এমন কল্পনা করতে পারি ?

এরা কি মানুষ ? হৃদয় নেই, অনুভূতি নেই, মাংসপিণ্ড, জড়পদার্থ,—

ঊর্দ্ধশ্বাসে ট্রেণ ছুটে চলেছে। অম্বিকা যেন রূপকথার রাজকুমার। ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যার সন্ধানে আজ যেন পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে সে সওয়ার। শূন্যে দু'টো ডানা ছড়িয়ে দিয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পক্ষীরাজ চলেছে উড়ে। ডানার প্রতিশব্দে চারিদিক মুখরিত। কামরার ধারে হাতের উপর মুখ রেখে অম্বিকা বাইরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

কামরার মধ্যে হঠাৎ গোলমাল করে' উঠল সকলে। সেই রুগ্ন বৃদ্ধ লোকটি দু'টি চোখ বিস্ফারিত ক'রে ভীষণ কাসছে, অজয় কখন উঠে গিয়ে দু'হাতে তার বুক-পিঠ ধরে বসিয়েছে, যুবকটি বাতাস করছে মাথায়। কামরার

অন্যান্য কুলী যাত্রীরা সকলেই দূরে সরে' বসেছে, অনেকে পোঁটলাপুঁটলির সঙ্গে বাক্সের উপরেও উঠেছে। এক কোণে সেই স্ত্রীলোকটি জড়সড়ভাবে কাঠের মত নিস্পন্দ হ'য়ে বসে' আছে।

যুবকটি বলল : "ওষুধটা বার করে' দাও তো মা—"

অম্বিকা শিউরে উঠলো। মা? একরাশ ধোঁয়া অম্বিকার চোখের সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল। বাইরের দিকে ফিরে চাইল সে, আকাশে মেঘ জমেছে। ট্রেণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে' চলেছে খণ্ডমেঘ। মেঘদূত আর লৌহদূতের দৌড়-প্রতিযোগিতা।

ষ্টেশনে যখন ট্রেণ পৌছাল তখন রাত প্রায় একপ্রহর হবে। ষ্টেশন থেকে জমিদার গৃহ ষোল মাইল পথ। বাসে যেতে হয়। ষ্টেশনে নেমে অজয় খোঁজ নিয়ে জানল সে-রাতের মতো বাস বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। পরদিন সকাল ভিন্ন যাবার কোনো উপায় নেই। রণেশ ষ্টেশনে অপেক্ষা করার প্রস্তাব করল। অজয় বলল : তা কিছুতেই হয় না, বেরিয়েছি যখন তখন আজই পৌছতে হবে, ষোল মাইল আর এমন কি পথ?" রণেশ রাজী হল। অম্বিকাও আপত্তি করল না, পরদিন সন্ধ্যার মধ্যে তাকে ফিরতেই হবে। অফিসে নূতন ভার পড়েছে কাজের, কামাই করলে চলবে না।

ষ্টেশনেই তাদের একজন সঙ্গী মিলল। গ্রামেরই লোক, কিছুদূর পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গী হবে। লোকটি জিজ্ঞাসা করল : বাবুদের কাছে আলো আছে?" কাছে টর্চ্চ ছিল, রণেশ বলল, "হ্যাঁ"। পুনরায় প্রশ্ন হ'ল : "লাঠিগাছটা?" রণেশ বলল দরকার হবে নাকি?" "না তা নয়, তিনজন আছেন, কিছু দরকার নেই। আর এখন কোনো ডর নেই বাবু, সোজা সড়ক চলে' যাবেন, তবে

একটা গাঁ পড়বে সামনে—" লোকটি একটু থম্‌কালো। রণেশই উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল: "সেখানে কিছু ভয়ের কারণ ঘটেছে না কি?" "না, মানে তেমন কিছু না, সাঁওতালদের গাঁ,—বানের জলে এবার এদিক্‌কার সব ভেসে গেছ্‌লো—চাষাভূষোরা খেতে পায় না, মরে হেজে যাচ্ছে। তবে এখন আর তেমন ডর নেই, পুলিশে বাবু প্রায় ঠাণ্ডা করে' দেছে। সাঁওতালরা মেয়ে মরদে মিলে দল বেঁধে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে' আগুন ধরিয়ে দিত—সড়ক দিয়ে চলবার জো ছিল না, পেছু থেকে সামনে থেকে বল্লম ছুড়ে' মারত, তাকের বলিহারি যাই বাবু—আস্ত লোকও পুড়িয়ে খায়। ঘর ছেড়ে মাঠে জঙ্গলে সব থাকে, বাঁশী, মাদলনাগরা বাজিয়ে খিধে তেষ্টা ভুলে' গিয়ে সারাদিন সব নেচে বেড়ায়, রাতে তীর ধনুক আর বল্লম নিয়ে মেয়ে মরদে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে বেরোয় লুঠ্‌ করতে। মাদলনাগরার শব্দ শুনলেই গাঁয়ের লোক ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। গোঁয়ার জাত বাবু—"

আতঙ্কে সমস্ত শরীর শিউরে উঠলেও, দুর্ভিক্ষের এমন রূপ প্রত্যক্ষভাবে দেখবার জন্য অম্বিকার লোভ হল খুব। অজয় উল্লসিত হ'য়ে বলল: "ও কিছু ভয় নেই, সাঁওতালদের সঙ্গে বহুদিন আমি ছিলাম, ভারী সুন্দর জাত ওরা, আমি সব ঠিক করে' নেব।" ভরসা হল। অজয়ের কথায় সকলেরই অগাধ বিশ্বাস। অজয়ের কাছে সত্যিই যেন অজেয় কিছু নেই। লোকটি যাবার সময় বলে' গেল: "গাছের দু'একটা ডাল ভেঙে নেবেন বাবু—চলে যান কোনো ভয় নেই।" অভয় দিলেও লোকটি বার বার বিপদের আভাষ দিতে ভুল করেনি।

তিনজনেই হন্‌ হন্‌ করে' পথ চলতে লাগল। রাত ক্রমেই গভীর হল। চারিদিকে শুধু একটানা সোঁ সোঁ শব্দ। মাঝে মাঝে গাছের ডালে পাখীর

ডানা ঝাপ্‌টানি। উপরে ধীরে ধীরে আকাশে মেঘ জমাট বাঁধে। ঝিরঝিরিনি ষ্ট নামে। অজয় সকলের আগে আগে চলে—দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ ঈষৎ সঞ্চালিত করে' গুরু গম্ভীর কণ্ঠে মাঝে মাঝে মেঘের দিকে চেয়ে অজয় সুর করে' সূর্য্যস্তোত্র আবৃত্তি করে: জবাকুসুম সঙ্কাশম্, কাশ্যপেয়ম্ মহাদ্যুতিম্, ধান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নম্, প্রণতোস্মি দিবাকরম্। এই স্তোত্র আবৃত্তি অজয়ের সহযাত্রীদের কাছে নূতন না হলেও নিস্তব্ধ অন্ধকার রাতে আজ তার মুখে এই আবৃত্তি শুনে অম্বিকার শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। দ্বিগুণ শক্তি ও উৎসাহে সে পথ চলতে লাগল।

আবৃত্তি করতে করতে অজয় জিজ্ঞাসা করল: "তোরা সব ঠিক আসছিস্ তো রুণু?" রণেশ উত্তর দিল: "আস্‌ছি, কিন্তু এখন তুমি সূর্য্য দেখলে কোথায়?" "ভোর হলেই দেখতে পাবি," অজয় হেসে উঠল।

শট্ শট্ করে' অম্বিকার পাশ দিয়ে কি চলে' যায়। একটি একটি করে' এমনি কয়েকটি প্রাণী বনবাগানের মধ্যে অন্তর্ধান করে' যায়। অম্বিকা জিজ্ঞাসা করে: "কি রে রুণু?" রণেশ চুপ করে' থাকে। দূরে দু'টি চোখ জল্ জল্ করে' উঠতেই দু'জনেই থম্‌কে দাঁড়ায়। অজয় অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে, তাকে চেঁচিয়ে ডাকে। অজয় টর্চ্চ ফেলতেই দেখে শেয়াল। হো হো করে' হেসে উঠে অজয় বলে: "নিঃশ্বাস পড়ছে তো রে? শেয়াল দেখেই এই—"। "দেখলে কি আর এই হ'ত"—রণেশ বলল। "বোঝা গেছে, তোরা আগে চল্, আমি পিছনে যাচ্ছি।"

পিছনে অজয় আসছে, আর কোনো ভয় নেই। সামনের গাছ থেকে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করে' শব্দ হ'চ্ছে, তু-থু-লু, মু-থু-লু, বাতাসে অন্ধকারের উপর দিয়ে কে যেন গুম্ গুম্ করে' পা ফেলে চলেছে। দূরে কে যেন কঁকিয়ে

কঁকিয়ে কাঁদছে। দু'জনেই আবার থম্‌কে দাঁড়াল। অজয় বলল: "তুইথুলি মুইথুলি পাখী ডাক্‌ছে, ভয় নেই।" "কাঁদছে কি?" অম্বিকা বলল। "শকুনি" বলে' অজয় আপন মনে স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে জোরে হাঁটতে লাগল।

শকুনি কাঁদছে। করুণ একটি ক্ষীণ স্বর বাতাসে ভেসে ঢেউ তুলে চলেছে। যেন প্রকৃতি কাঁদছে। স্নেহের সন্তান গ্রামগুলির এই মর্ম্মস্পর্শী শ্রীহীন রূপ দেখে প্রকৃতি মা কাঁদছে। বন্ কাঁদছে, মাঠ কাঁদছে, আকাশে মেঘ কাঁদছে অজস্র ধারায়। গ্রামের সেই শ্যামলিমা, সেই প্রশান্ত রূপ নেই। অনাবৃষ্টি আর অতিবৃষ্টিতে সব নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছে। বন্যা আর দুর্ভিক্ষের ক্ষতচিহ্নে রূপ আজ বিকৃত, বীভৎস। গভীর রাতে সন্তানের মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন দেখে শিউরে উঠে প্রকৃতি কাঁদছে, আর কঙ্কালসার গ্রাম ধুক্‌ছে শুয়ে শুয়ে।

দপ্ করে দূরে আগুন জলে ওঠে। অজয় পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল। ভয়ে অম্বিকা ও রণেশ দু'জনেই দাঁড়িয়ে পড়ল। অজয় এগিয়ে এসে গায়ের জামা খুলে' ফেলে, কাপড় গুটিয়ে আঁটসাঁট্ করে' বেঁধে নিল। পাশের বাগান থেকে কতকগুলি ডাল আর লতা পাতা নিয়ে এল ছিঁড়ে। দু'হাতে, কোমরে, মাথায় সেগুলি বাঁধল। সমস্ত দেহ ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসে ফুলিয়ে নিল, তারপর দু'হাতে দু'টি পাতাভরা গাছের ডাল নিয়ে সেই দিকে এগিয়ে চলল।

আগুন ক্রমেই কাছে আসছে। আগুনের চারিদিকে কালো কালো ছায়া-মূর্ত্তিরা বসে' রয়েছে। অজয় হাত দু'টি প্রসারিত করে' পা তুলে' চলতে লগল। ক্রমে দ্রুততালে তার পা পড়তে লাগল মাটিতে। তারপর 'হা-হৈ' করে' বিকট শব্দ করে' সে উন্মত্তের মতো নাচতে সুরু করল। সাঁওতালী ভাষায় গান গাইতে গাইতে নেচে চলল আগুনের দিকে,—

হিঃ-হাঃ-হুন্‌তা,-হাঃ-হিঃ-হুন্‌তা—

মাইঝান্ হামার ফুল—

কথার শেষে 'মাইঝান্' বলে' অজয় সুর টানে, কালো ছায়ামূর্ত্তিরা সব সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ায়, নড়ে' ওঠে, দুলে' ওঠে, তারপর চক্রাকারে নাচতে আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে মাদলনাগরার শব্দ হয়, বাঁশী বাজে, ছায়ামূর্ত্তিরা কলরবে কি ইঙ্গিত জানায়, দূর থেকে প্রত্যুত্তর আসে। অজয় তখন আগুনের পাশে ছায়ামূর্ত্তিদের সঙ্গে নাচের তালে তালে মিলে গিয়েছে।

একদল সাঁওতাল মেয়ে চক্রাকারে অজয়কে ঘিরে নাচছে। মাঝখানে সে-ও নাচছে। অদ্ভুত দৃশ্য! কাছাকাছি একটিও পুরুষ সাঁওতাল নেই; দূর থেকে যে শব্দ শোনা গিয়েছিল তা পুরুষদের কণ্ঠস্বর। অম্বিকা ভাবলো হয়ত কাছাকাছি সাঁওতাল মরদেরা কোথাও অপেক্ষা করছে।

এই কি দুর্ভিক্ষের রূপ? এর চেয়ে সুন্দর আর কী আছে তা হলে পৃথিবীতে? কোথায় সেই শুকনো হাড় আর বিবর্ণ রক্তের বীভৎসতা? কোথায় মুমূর্ষুর সেই কাতর গোঙানি, বুভুক্ষার সেই আদিম ভয়াল মূর্ত্তি? মানুষের মাংস মানুষে গোগ্রাসে গেলে কৈ? গাছের ডালে ডালে এখন পাতা আছে, মাঠের সবুজ রং ফিকে হলেও কোথায় সেই সর্ব্বগ্রাসী ধূ ধূ-ধূসরতা? কোমরে একটুকরা কাপড় জড়িয়ে, বুকে একটুকরা ফালি বেঁধে, কালো কালো মূর্ত্তিগুলি নাচছে আর গান করছে। সুরে ও ছন্দে মিলে দুর্ভিক্ষের যে রূপ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, অম্বিকা তাকে মনে মনে প্রণতি না জানিয়ে পারল না।

চক্রনৃত্য ভেঙে গেল। ইসারা করে অজয় তাদের দু'জনকেই তাকে অনুসরণ করতে বলল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দুই বন্ধু তাকে অনুসরণ করল। দু'জনেই

নির্ব্বাক্। একদল সাঁওতাল মেয়ে মাঠের একপাশ দিয়ে দলভেঙে নাচতে নাচতে চলল। আর একটি মেয়ের হাত ধরে' নাচতে নাচতে চলল অজয়। মেয়েটি গাইছে ঃ—"মা-ঝি—, তুই নি হামার পরাণ ফুল রে"—অজয় গাইছে, —"হা-রে মাইঝান্—তড়াক্-তড়াক্-হাঃ"। ওদিকের মেয়েদের দল নাচের তালে তালে সুর ধরছে ঃ হুন্-তাক্-হি-তাক্"।

পাশেই গ্রাম। সামনে অন্ধকারের মধ্যে একটি কুঁড়ে ঘর। কালো কালো দুই লম্বা মূর্ত্তি বল্লম নিয়ে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল। রণেশ অম্বিকাকে চুপি চুপি বলল ঃ "এই বার মরবে"। কথাটি অজয়কে লক্ষ্য করেই বলা হল। অজয়ের নাচ তখন থামে নি। নাচতে নাচতে দুজনেই কুঁড়ের ভিতর অন্তর্ধান করল।

মর্ম্মর মূর্ত্তির মতো স্তব্ধ হয়ে অম্বিকা ও রণেশ কুঁড়ের সামনেই দাঁড়িয়ে রইল। দূরে গাছতলায় বিরাট দুই কৃষ্ণমূর্ত্তি। দু'জন সাঁওতাল মাঝি। তাদের হাতের উদ্যত দুটি শাণিত বল্লম অন্ধকারের মধ্যে ঝক্ ঝক্ করে' উঠল। মেঘে মেঘে সমস্ত আকাশ তখন আচ্ছন্ন।

কিছুক্ষণ পরেই দু'জনে কুঁড়ের বাইরে এসে দাঁড়াল। অজয় এগিয়ে এসে বলল ঃ আমাকে একটা টাকা দে তো অম্বু—আর আমার গায়ের চাদরটা।" কথার সুরে জড়তা মিশ্রিত।

টাকা ও চাদর নিয়ে অজয় ফিরে গেল সাঁওতাল মেয়েটির কাছে। অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা গেল মেয়েটি হাত পেতে সেগুলি নিলে, চাদরটি খুব কসে' বুকে বাঁধল, তারপর দুজনেই অদ্ভুত শব্দ করে' দু'হাত ধরে' একবার লাফিয়ে উঠে কোমর থেকে মাথা পর্য্যন্ত হেঁট করে' ছেড়ে দিলে। অজয় ফিরে এল।

দুই বন্ধুর মুখ দিয়ে কোনো কথাই উচ্চারিত হ'ল না। অন্ধকারের মধ্যে শুধু একটি কথা বার বার অম্বিকার মনে হতে লাগল—দুর্ভিক্ষ !

জমিদার গৃহের বহিরঙ্গনে যখন সকলে পৌঁছাল তখন রাত প্রায় তিন প্রহর। সামনে বহুদূরব্যাপী বৃহৎ অট্টালিকা অন্ধকারের মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করছে। কোনদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। রণেশ হন্ হন্ করে' এগিয়ে গেল। গৃহ উদ্যান, পুষ্করিণী, পূজামণ্ডপ, আস্তাবল, কাছারী বাড়ী পার হয়ে অন্দর মহলের ফটকের সামনে এল। ফটকের মাথায় বিরাট দুই চূণবালিখসা সিংহমূর্ত্তি। রণেশ খুব জোরে হাঁক দিল: "বিহারী, বিহারী"। চারমহল অন্দর-ভবনের চতুষ্কোণ থেকে শব্দটি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল, কোনো সাড়া মিলল না। কিছুক্ষণ পরে লণ্ঠন হাতে একজন প্রৌঢ় ভৃত্য বেরিয়ে এল। রণেশ বলল: "কে' হারাণ না কি ?" জবাব এল: "হ্যাঁ বাবু—এত রাত্তিরে ?" "কল্‌কাতা থেকে আসছি, বিহারী এখানে আছে তো ?" "আর আছে দাদাবাবু ! আজ দশ বার দিন বিহারী মারা গেছে। রাঙাদিদির বিয়ে দেখার ইচ্ছে ছিল খুব বুড়োর, দিনরাত বলত এইবার আমার রাঙাদিদির সঙ্গে সহরে চলে' যাব আর ফিরব না,—বুড়ো হাড় গঙ্গা পাবে—"। "হুঁ" বলে' রণেশ কয়েক মিনিট গুম্ হয়ে রইল, তারপর বলল: "ভেতরে চল্,দাঁড়িয়ে কথা বলবার শক্তি নেই।"

অম্বিকার চোখের সামনে পক্ককেশ, শিথিল-চর্ম্ম এক বৃদ্ধের মূর্ত্তি ভেসে উঠল, কৌতূহলী দৃষ্টিতে যেন তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। কোটরস্থ ঘোলাটে দুটি চোখ যেন অট্টালিকার চারকোণে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

রমাকান্তবাবু সকলের আপ্যায়ন অভ্যর্থনার জন্য অত্যন্ত বিব্রত হয়ে উঠলেন। গরম জল, গরম দুধ প্রভৃতির তৎক্ষণাৎ বন্দোবস্ত হয়ে গেল। প্রকাণ্ড একটি হলঘরে ফরাস পাতা হল। ঘরে এসে তিনি বলে' গেলেন সকলকে বিশ্রাম করতে। ঘণ্টাখানেক পর, তিনি নিজেই এসে সকলকে ডাক দিলেন, সামান্য কিছু আহার করে' বিশ্রাম করবার অনুরোধ জানিয়ে। আহারের ঘরে তিনখানি রূপার থালার উপর চূড়া করে' ছোট ছোট লুচি সাজান। চারিদিকে রেকাবিতে নানা রকম ভাজা, মোরব্বা, আচার। রমাকান্তবাবু সামনে বসলেন।

অম্বিকা যেন যাদুমন্ত্রে বশীভূত হয়েছে। রমাকান্তবাবু হঠাৎ বললেন: "রাণু আমার খুব কাজের মেয়ে, এ-সব তারই হাতে তৈরী"। অজয় বলল: "অসময়ে আপনাদের বড় বিরক্ত করলাম—এটা অবশ্য আমারই গোঁয়ার্তুমিতে হয়েছে, ষ্টেশনে অপেক্ষা করলেও হ'ত।" "না-না-কিছু না—আপনাদের এ-উদ্যম তো প্রশংসনীয়। আর আমার তো ওঠবারই সময় হয়েছিল প্রায়—এই সময় উঠে একটু পূজো আহ্নিক করি—তারপর একা একা একটু স্বরচর্চ্চা করি—ও অভ্যাসটা আজও ছাড়তে পারিনি। আর রাণু তো এর আগেই ওঠে, আমার পূজোর ফুল তোলে, রাজ্যেশ্বরের পূজোর জোগাড় করে, সবই তো ওই করে—আর কে আছে বলুন—বিহারী তার নাত্নীটির ভার দিয়ে গেছে আমার ওপর—এখন সেই রাণুর একমাত্র সঙ্গিনী—দু'জনেই সমবয়সী কি না?"

অম্বিকা আগে শুনেছিল রণেশের কাছে যে, রমাকান্তবাবু কথা বলতে আরম্ভ করলে সহজে থামেন না।

"আমাদের বংশের নিয়ম অতিথিকে ঘরের মেয়েরাই রেঁধে খাওয়াবে, রাঁধুনি-বামুনে নয়। আমার বাবা কোনো অতিথি এলে তাঁর খাওয়ার পর সেই

পাতেই খেতেন—বলতেন অতিথি দেবতা। এটা আমাদের বংশের ধারা—" বলে' রমাকান্তবাবু হাসলেন।

আহারান্তে অজয় বলল: "ভোর প্রায় হয়ে এসেছে, একেবারে সকালে স্নান করে' ঘুমুলেই হবে।" "বেশ, বেশ, তাই ভাল, তা হ'লে আসুন, রুণু তুমি ভিতরে যাও"—বলে' রমাকান্তবাবু দরজা দিয়ে আর একটি ঘরে প্রবেশ করলেন।

ঘরের মধ্যে ঢাল, তলোয়ার, খাঁড়া, সড়কি, বল্লম, হাতিয়ার, বন্দুক সব সাজান রয়েছে। অস্ত্রাগার। বল্লম আজ আর শাণিত নেই, মরচে পড়ে ভোঁতা হয়ে গেছে। সোণা বাঁধান একখানা তলোয়ারের দিকে আঙুল দেখিয়ে রমাকান্তবাবু বললেন, "এটি নীলকুঠির সাহেব হ্যারিংটন্ আমার বাবাকে উপহার দিয়েছিলেন। বাবা তখন ছিলেন নীলকুঠির দেওয়ান। বাবার ক্ষমতাও ছিল অসীম। রাতারাতি হাজার বিঘে জমি দখল করলেন। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার মশাই। রাতারাতি সব গ্রাম বেমালুম পুড়ে' নিঃশেষ হয়ে গেল, দু'একশ লাঙল পড়ল জমির বুকে, জমি চষা হয়ে গেল। ভোরে প্রমাণ হ'ল যে, সেখানে কোনো লোকের বাস ছিল না, জমি সাহেবের।" রমাকান্ত-বাবুর চোখেমুখে উত্তেজনা ও আবেগ পরিস্ফুট। অম্বিকা অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিল। অস্ত্রাগার পার হয়ে আর একটি ঘরে রমাকান্তবাবু ঢুকলেন। ঘরের চারিদিকে মর্ম্মর মূর্ত্তি, ব্রঞ্জের মূর্ত্তি, দেয়ালে ঘোড়ার পিঠে তলোয়ার-যুদ্ধের তৈলচিত্র। সে-ঘর পার হয়ে আর একটি ঘর। ঘরের মেঝে বাঘের চামড়া দিয়ে মোড়া। চারিদিকে বাঘ, ভল্লুক, হরিণ, কাঠের বড় বড় পাটাতনে বিদ্ধ। এদের শীকার করা হয়েছিল এক সময়, এরা ছিল হিংস্র বন্য জন্তু। পাশেই আর একটি ঘর। বিরাট হলঘর, গালিচা পাতা,

ঝাড় বাতি ঝুলছে। চারিদিকে নানারকম বাদ্যযন্ত্র। পিয়ানো, অর্গ্যান, সেতার, বেহালা, এসরাজ, তানপুরা, সারেঙ্গী, তব্‌লা, মৃদঙ্গ, পাখওয়াজ। প্রমোদ কক্ষ। একদিন এই হলঘরের মেঝেতে রাতভোর নূপুরের শিঞ্জন শোনা যেত, গেলাসের পর গেলাস মদ উজাড় হত। আজ ঘরের কোটরে কোটরে সুধু পায়রার গুঞ্জন ধ্বনি, চড়ুইয়ের কিচিরমিচির।

মেঝের একধারে ফরাসের উপর রমাকান্তবাবু বসলেন। সকলেই বসল। রমাকান্তবাবু বল্লেন, "এই দিকটা একটু বাস করার মতো করে' রেখেছি,—জীবনের গোণা দিনগুলো এইখানেই কাটিয়ে দেব, কোথাও যাব না। আর কোথায়ই বা যাব ? কোনো দরকার নেই, এইটুকু একরকম থাকলেই হ'ল। সব ধসে পড়েছে'—আর পড়বেই বা না কেন, নীলকুঠির আমলের বাড়ী, নীলকুঠির আশপাশ দিয়ে গ্রামের লোকেরা হাঁটে না, বন জঙ্গল হয়ে গেছে, বলে রাতে ঘোড়ার পিঠে চড়ে' সাহেব নাকি ঘুরে বেড়ায়। সেদিন কাছারী বাড়ীর ঘরের একটা ছাদ ধসে পড়ল, সাপ-ঘোগের বাসা, মিস্ত্রী লাগিয়ে ওদিকটা ভেঙে ফেলছি। আর কি আছে বলুন—রাণুর বিয়ের পর একা থাকতে হবে বলে' মনে করেছি বিহারীর নাত্‌নীটির বিয়ে দিয়ে এখানেই রাখব—বড় লক্ষ্মী মেয়ে—বিহারীর শেষ কথা, রাখতে হবে বৈ কি—"

রমাকান্তবাবুর মুখের উপর মৃত্যুর ছায়া নামে। সামনে যেন তাঁর আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা। অম্বিকা একদৃষ্টে সেই মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

রমাকান্তবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন : "আমার পূজার সময় হয়েছে। ভোর প্রায় হয়ে এল। আপনারা একটু পায়চারি করুন। এদিকটা বরাবর ছাদের উপর বেড়াতে পারেন, পশ্চিম দিকে যাবেন না, ওদিকটা ভাঙা হ'চ্ছে। আর মেয়ে দেখাটা বিকেলেই সারা যাবে, কি বলুন ?"

অজয় বলল : "আজ্ঞে, সে যখন আপনার সুবিধা হবে ব্যবস্থা করবেন, তবে আজই বিকেলে আমাদের ফিরতে হবে, হঠাৎ এসেছি কি না?" "তা বেশ, তা হ'লে একটু আগেই ব্যবস্থা করা যাবে।" রমাকান্তবাবু হাসতে হাসতে চলে' গেলেন।

ভোর হল।

সেতারে ভৈঁরোর ঝঙ্কার শোনা গেল। রমাকান্তবাবু সুরালাপ করছেন।

অম্বিকা ও অজয় ছাদের চারিদিক ঘুরে জমিদার প্রাসাদ দেখছিল। ধুপ ধাপ্ করে' শব্দ হল দূরে।

অজয় বলল : "মিস্ত্রীরা কাজ করছে বোধ হয়, ঘর ভাঙছে।" সেইদিকে সে এগিয়ে গেল। পশ্চিমদিকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অম্বিকা ভাবতে লাগল, এই বৃহৎ অট্টালিকা, কত পরিশ্রমই না করতে হয়েছে একদিন গড়তে। এই মিস্ত্রীদের বাপ্ঠাকুরদারা একদিন যত্ন করে' এই অট্টালিকা গড়েছিল। আজ এরা তাকে গান গেয়ে গেয়ে ভাঙছে।

পূবাকাশ লাল রঙে রঞ্জিত হয়েছে। হঠাৎ ফিরে চাইতেই নীচে রমেশের দৃষ্টি পড়ল একটি বহু পুরাতন মন্দিরের উপর। গৃহদেবতা রাজ্যেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের ধাপে একটি তরুণী শাঁক হাতে করে' দাঁড়িয়ে আছে, সাদাসিধে পরিষ্কার একখানি শাড়ী পরণে। শাঁকটি মুখে উঠতেই চারিদিক তার শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। মন্দিরের ঘর থেকে আর একটি তরুণী বেরিয়ে এল, ফুলের সাজি হাতে। একরাশ চুল পিঠের উপর আলুথালু ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। পরণের রৌপ্যখচিত লাল শাড়ীর উপর সূর্য্যের সোনালি কিরণ

এসে পড়তে ঝল্‌মল্‌ করে' উঠল। ফুলের সাজি নামিয়ে উদীয়মান সূর্য্যের দিকে ফিরে নতশিরে তরুণীটি প্রণাম করল।

অম্বিকার চোখের সামনে মুহূর্ত্তের মধ্যে ভেসে উঠল, সেই ট্রেণের সহ-যাত্রীদের মূর্ত্তি, সেই বৃদ্ধ হাঁপানি রুগীর পাণ্ডুর মুখ, তরুণী বধুর শূন্য হতাশ দৃষ্টি, সাঁওতাল মাইঝানদের নৃত্য, কুঁড়ে ঘর, আর উদ্যত দুটি শাণিত বল্লম্। মুমূর্ষু স্বামীর পাশে বসে' তরুণী বধুটি এতক্ষণ হয়ত অজস্র ধারায় চোখের জল ফেলছে, জীবনের সূর্য্য তার অস্তাচলে। পশ্চিমা কুলিটি এতক্ষণ হয়ত তার শূন্য ঘরের দরজার সামনে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে, ঘরে তার সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে, শূন্য ঘর। আর সেই সাঁওতাল মেয়েটি? শাণিত বল্লম এতক্ষণ তার বুকে বিঁধেছে। দুর্ভিক্ষ তাকে ক্ষমা করে নি। বর্ব্বর সাঁওতাল মাঝি তার মাইঝান ফুল-কে এতক্ষণ বল্লম-বিদ্ধ করেছে। আর এই অজয়! অন্ধকারে শকুনির কান্নার সঙ্গে তার সেই সূর্য্যস্তোত্র আবৃত্তি—

মিস্ত্রীরা একসঙ্গে গান করতে করতে পশ্চিম দিকে ঘরের খিলান ভাঙছে। লাল টুকটুকে সূর্য্যের দিকে ফিরে অম্বিকা মনে মনে বলল: প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

১৯৪০

বিচার

গভীর রাতে সমস্ত শহর ঘুমিয়ে আছে। শেষ স্পন্দনটুকুও প্রায় থেমে গিয়েছে। মাঝে মাঝে দু' একটা কুকুর ডাকে, পুলিস হাঁক দিয়ে যায়। দ্বিতল কামরায় এক নির্জ্জন ঘরে বিছানায় শুয়ে প্রিয়নাথবাবু ভীষণ জোরে চীৎকার ক'রে ওঠেন। স্ত্রী সুচারু দেবী শয্যা ছেড়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার শোনেন, কোনও উত্তর দেননা। ঘরের ভিতরে প্রিয়নাথবাবু সমানে চীৎকার ক'রে যান, খুন করেছে, খুনী। সুচারু দেবী ঘরে ঢুকে বলেন, চুপ কর, চল, শোবে চল। স্বামীর হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেন।

কিছুক্ষণ পর আবার চীৎকার সুরু হয়। এইবার সুচারু দেবী ঘরে ঢুকে রীতিমত ঝাঁঝালো স্বরে বলেন, "একটু কি ঘুমুতেও দেবে না? রাতদিন জ্বালাতন করবে?"

প্রিয়নাথবাবু চুপ ক'রে ব'সে থাকেন। সুচারু দেবী নিজের ঘরে ফিরে যান। ঘুম আসে না। কিছুক্ষণ পরে আবার চীৎকার করেন প্রিয়নাথবাবু, আরও বিকটভাবে। সুচারু দেবী বিরক্তির স্বরে বলেন, "কি, হয়েছে কি তোমার? কালই তোমাকে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করব। পাড়ার লোককে পর্য্যন্ত টিকতে দেবে না—আশ্চর্য্য!"

প্রিয়নাথবাবু বলেন, চারিদিকে রহমন ঘুরে বেড়ায় চারু—খুনী রহমন, আর বলে কি জান? বলে, হুজুর, খুন আমি করি নি। পাজী, বদমাস!

সুচারু দেবী ধমক দিয়ে বললেন, "যত পাগলামির উপসর্গ তোমার রাতেই বাড়ে নাকি? আমি আর পারি না সহ্য করতে, আমাকে রেহাই দাও, দোহাই তোমার।"

রেহাই দিয়েছি চারু, পেন্‌শনের অর্দ্ধেক টাকার, এই তো? জানি—চলে যাও তুমি, যাও—যাও—বেরিয়ে যাও বলছি।—প্রিয়নাথবাবু হঠাৎ খুব জোরে চীৎকার ক'রে ওঠেন। প্রতিবেশীদের ঘরে বাতি জ্বলে ওঠে। সুচারু দেবী অপ্রস্তুত হয়ে সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলেন, কি হচ্ছে কি? বদ্ধ পাগল হলে নাকি?

এমনই ভাবে দিনের পর দিন কেটে যায়। সুচারু দেবীর অবকাশ নেই নিঃসঙ্গতার। প্রিয় বান্ধবী সবিতা দেবীর স্বামী ব্যারিস্টার বাসু প্রত্যহই

সকালে আসেন স্থচারু দেবীর চায়ের টেবিলের একাকিত্ব দূর করতে। দু'জনে অনেকক্ষণ প্রিয়নাথবাবুর সম্বন্ধে আলাপ হয়, কোনো কোনো দিন ব্যক্তিগত আলাপে বিনিদ্র রাত্রির ক্লান্তি স্থচারু দেবী ভুলে যান। সম্প্রতি স্বামীর পেন্‌শন গ্রহণের পর তিনি গার্লস কলেজে অধ্যাপনা স্থরু করেছেন। বন্ধুবান্ধবীরা জিজ্ঞাসা করলে বলেন, এটা শখ নয়, নেসেসিটি—একটা যা হোক অ্যাসোশিয়েশন তো দরকার! দিনরাত ওঁর পাগলামি শোনার পেশেন্স নেই আমার, হেল—হেল—ভেরিটেব্‌ল হেল!

নরকের জ্বালা স্থচারু দেবী দূর করেন সকালে মিঃ বাস্থর সঙ্গে ব্রেক্‌ফাস্টের টেবিলে, দুপুরে মেয়েদের কলেজে ইতিহাস পড়িয়ে, আর সন্ধ্যায় কোনো সান্ধ্য মজলিসে গল্পগুজব ক'রে। আর প্রিয়নাথবাবু?

দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে বাইরে। দোতলায় জানালার গরাদে ধ'রে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকেন প্রিয়নাথবাবু। কখনও কখনও দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে ওঠেন। তারপর বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকেন সিলিঙের দিকে চেয়ে। কড়িকাঠগুলো চোখের সামনে কাঁপতে থাকে, সজোরে একখানা টালি যেন খ'সে পড়ে প্রিয়নাথবাবুর মাথায়। উঃ! —ব'লে মাথা দু হাতে চেপে ধ'রে তিনি উঠে বসেন। দেয়ালের গায়ে কে যেন হিজিবিজি আঁচড় টেনে যায়—রহমন, রহমন, বদমাস, খুনী। তারপর অট্টহাসির শব্দ হয়। চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একা প্রিয়নাথবাবু ব'সে থাকেন।

প্রিয়নাথ সেন অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ। প্রায় বছরখানেক হল তিনি সে পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। বিচক্ষণ বিচারক বলেই তাঁর খ্যাতি

ছিল, এবং সে-খ্যাতি তিনি শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেই অবসর নিয়েছিলেন। দীর্ঘস্থায়ী একটি জটিল দেশদ্রোহিতার মামলার বিচার করবার পর কাগজের মারফৎ তাঁর বিচার-বুদ্ধির প্রশস্তি দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তার কিছুদিন পরেই তিনি বিচারকের আসন থেকে বিদায় নেন।

অবসর-দিনের প্রশস্ত পরিসরের মধ্যে অল্পদিনেই তাঁর জীবনে এক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। মানুষের সাহচর্য্যের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা, নির্জ্জনতা তাঁর প্রিয়। ঘরের চার কোণে হয় তিনি পায়চারি ক'রে বেড়ান, নয় চুপ ক'রে গুম হ'য়ে ব'সে থাকেন। দিন দিন যেন নিজের মধ্যে তিনি অসহায়ের মতো দুর্নিবার বেগে তলিয়ে যেতে লাগলেন।

বাইরে অন্ধকার নামল, ভিতরে আলো জ্বলল। ভিতরের আলো দিয়ে বাইরের এই অন্ধকার দূর করা হল না। বাইরের অন্ধকারই আজ ভিতরের এই আলোর উৎস। কিন্তু এই আলোই যেন প্রিয়নাথবাবুর আজ ভাল লাগে—ভাল লাগে এই আলোয় ডুব দিয়ে থাকতে। বাইরে নিবিড় অন্ধকার ঘুমিয়ে আছে, থাক।

একা ঘরে প্রিয়নাথবাবু চুপ ক'রে ব'সে থাকেন। কখনও নির্জ্জন দুপুরে, গভীর রাত্রে জোরে চীৎকার ক'রে ওঠেন, খুনী—খুনী—খুনী। প্রতিবেশীরা করুণার সুরে বলে, জজ সাহেব পাগল হয়েছে। সুচারু দেবী রুক্ষ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। প্রিয়নাথবাবুর চোখের দুই কোণে অনিদ্রার কালো রেখা, সমস্ত মুখের উপর অর্থহীন উদাসীনতার ছাপ। ফ্যাকাশে হাসি হেসে প্রিয়নাথবাবু ডাকেন, চারু! তারপর নিজের মাথার একরাশ চুল মুঠো ক'রে ধ'রে বলেন, আচ্ছা, আমি পাগল হয়েছি, না?

"তুমিই জান।"

"তার চেয়েও বেশি জান তুমি, আর কে জান? ব্যারিস্টার বাসু।" প্রিয়নাথবাবু আবার ফ্যাকাশে হাসি হাসেন। বলেন, "চায়ের টেবিলে তোমরা আমাকে পাগল ব'লেই তো জাজমেণ্ট দিয়েছ—দাও নি?"

"প্রলাপ শোনবার সময় নেই আমার"—ব'লে স্থচারু দেবী চলে যান। প্রিয়নাথবাবু ডাকেন, শোন, শোন, হ্যাম্‌লেট পড়েছ? কুইন অফ ডেন্‌মার্ক?

সেদিন প্রিয়নাথবাবু নীরবই ছিলেন। যথারীতি চাকরে এসে সন্ধ্যার পর খাইয়ে দিয়ে গিয়েছে। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ রয়েছে, কোনো সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ গভীর রাত্রে ঘর থেকে বিকট চীৎকার শুনে স্থচারু দেবীর ঘুম ভেঙে গেল। প্রিয়নাথবাবু চীৎকার করছেন, আগুন—আগুন!

প্রতিবেশীদের ভিড় জমল। দরজা ভেঙে দেখা গেল, প্রিয়নাথবাবুর বীভৎস ছাল-ওঠা দগ্ধ মূর্ত্তি ঘরের কোণে প'ড়ে রয়েছে—নিস্পন্দ। প্রিয়নাথ-বাবু আত্মহত্যা করেছেন।

স্থচারু দেবীর নজরে পড়ল, খাটের ধারে ছোট টেবিলের উপর তাঁর একখানা চিঠি। প্রিয়নাথবাবুর লেখা।

চারু,

লেখবার প্রয়োজন ছিল না, তবুও লিখছ। কয়েকটা কথাতে তোমার ভুল যদি দূর হয়, হোক। আজ আমি সত্যই বিচারক। অপরাধের শাস্তি দিতে কোনো দিনই ভয় পাই নি, তাই শ্রেষ্ঠ অপরাধীর শাস্তি দিলাম এবং দিয়ে গেলাম। রহমন খুন করেছিল গরীব একজন আমলাকে, প্রাণদণ্ড দিয়েছি। আমি খুন করেছি রহমনকে, আমার

প্রাণদণ্ড হল। এ অপরাধের ক্ষমা নেই। রহমন গ্রামে আগুন ধরিয়েছিল, সেই আগুন আমার ঘরে লেগেছে। পাগলামি মনে হ'চ্ছে? দুঃখ হবে না তোমার, কারণ আমার দুঃখ নেই। আমার সবচেয়ে বড় শাস্তি হ'চ্ছে যে, আমার ঔরসে এবং তোমার গর্ভে আমাদের কোনো সন্তান হয় নি। আমাদের জীবনের উত্তরাধিকারী কেউ নেই—এই তো শাস্তি। শুধু ভাবি, অপরাধী কে? রহমন? না, আমি? না, তুমি? এ আমার আত্মহত্যা নয়, রহমনের বিচার।

ল রিপোর্টের চার নম্বর আলমারির পিছনে আমার ১৯৩৮ সালের ডায়েরি আছে। ২২এ জানুয়ারির কয়েকটা পাতা অবসর সময়ে প'ড়ে দেখতে পার। আমার প্রিয় পিনাল কোডখানা আমার শবের সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলো।

প্রিয়নাথ সেন

যথাস্থান থেকে ডায়েরি নিয়ে সুচারু দেবী নিজের ঘরের এক কোণে পড়তে চ'লে যান। তাঁর বুকের ভিতর দুরদুর ক'রে ওঠে। ভয়ে ভয়ে তিনি পড়তে থাকেন।

রহমনের অপরাধ গুরুতর। শুধু খুন নয়, গ্রামে যাবতীয় বিদ্রোহ ও অসন্তোষের মূল রহমন। এই অভিযোগের সপক্ষে যা প্রমাণ পেয়েছি, বিপক্ষে তার কিছুই পাই নি। একমাত্র শুধু রহমনের স্বীকারোক্তি, কিন্তু তারও কোনো মূল্য নেই। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমার শেষ প্রশ্নের উত্তরে রহমন বলেছে—

'হুজুর, খুন আমি করি নি। আমার দলের কেউ দোষ করে নি। হুজুরের আইনে আমাদের সাজা হতে পারে। কিন্তু খুনী আমরা নই। জমিদারের একজন গরীব আমলাকে গ্রামের পথে খুন করতে আমরা নারাজ। আমাদের ধর্ম্মে তা বলে না হুজুর, আমাদের নালিশ তা নয়। বকেয়া খাজনা আর ঋণ মকুবের জন্যে গ্রামের সব চাষীরা ঘর ছেড়ে মাঠে বেরিয়ে এল। তাদের জব্দ করবার জন্যে জমিদার ভাড়াটে লোক দিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলে। আগুন আমরা ধরাই নি হুজুর। আমাদের বউ-ছেলে-মেয়ের ওপর মাঠের মাঝখানে যখন জমিদারের সিপাই গুলি চালাল, তখন আমরা দল বেঁধে জমিদারের বাড়ী ঘেরাও ক'রে হেঁকে বললাম, বিচার চাই। জমিদার তার জবাব দিয়েছিল আমাদের ওপর বেকসুর লাঠি চালাবার হুকুম দিয়ে। অনেক চাষী ভাই-বোনদের মাথা ধূলোয় লুটিয়েছিল। তবু জমিদারের বাড়ীর ইঁট পর্য্যন্ত আমারা ছুঁই নি। গরীব আমলাকে আমরা খুন করব কেন হুজুর? নিতাই মুহুরী ভাল লোক। তাকে খুন করেছে জমিদারের ভাড়াটে গুণ্ডা। নিতাই মুহুরীর অনাথা মেয়েকে রাত দুপুরে মুখে কাপড় বেঁধে জমিদারের সিপাইরা বাগান-বাড়ীতে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল। সাত দিন তার কোনো খোঁজ ছিল না। নিতাই মুহুরীকে সিপাইরা খুন করবে শাসিয়েছিল, কথা ফাঁস করলে। মুহুরী আমাদের বিশ্বাস করত। আমি জানতে পেরে দল বেঁধে গিয়ে তাকে নিয়ে আসি। নিতাই মুহুরীকে আমরা খুন করি নি হুজুর, এ ঘটনা আমরা জানি। আমাদের প্রাণে মারবার জন্যে জমিদার তার গরীব আমলাকে খুন করেছে, চাষার ঘরে আগুন জ্বালিয়েছে—

রহমন মিথ্যাবাদী। রহমনের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হ'ল। জুরিরা একমত হয়ে সকলকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন। রহমনের ফাঁসির হুকুম হ'ল।

তার দলের আর দুজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল, আর বাকি তিনজনের হ'ল দশ বছর ক'রে সশ্রম কারাদণ্ড।

জমিদার রাজা শিবনারায়ণ সিংহ মহাপ্রাণ ব্যক্তি। পঞ্চাশ হাজার টাকার অগ্রিম পুরস্কার পাঠিয়েছেন। তাঁর শুধু অনুরোধ ছিল, মামলা যেন ফেঁসে না যায়। গ্রামের চাষারা রহমনের জন্যে বিদ্রোহ করেছে, রহমনের মৃত্যু ভিন্ন গ্রামে শান্তি নেই। এ আর অনুরোধ কি? তাইই তো প্রমাণিত হল। পিনাল কোড প্রমাণ করেছে

চারুর উৎসাহও তো উপেক্ষণীয় নয়! চারু বলে, দু দিন পরে অবসর নিয়ে শহরে একখানা বাড়ী করবে—একলা জীবন—আমার কথাও তো ভাবতে হয়! সত্যিই তো!

সুচারু দেবীর হাত থেকে ডায়েরিখানা প'ড়ে গেল, শরীর ঝিমঝিম ক'রে উঠল। উঠে গিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন।

প্রিয়নাথবাবুর শব-পরীক্ষা শেষ হয়েছে। করোনার সাহেব রায় দিয়েছেন, প্রিয়নাথবাবু সাময়িক উন্মাদনার বশে স্পিরিট ঢেলে সর্ব্বাঙ্গে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। রায় নিয়ে মিঃ বাসু মর্গে এলেন। মর্গে সুচারু দেবী এসেছেন, সঙ্গে তাঁর প্রিয় বান্ধবী সবিতা দেবী। আরও অনেক বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এসেছেন। কারও হাতে ফুলের মালা, কারও হাতে ফুলের তোড়া। মর্গের ভিতর থেকে প্রিয়নাথবাবুর মৃতদেহ ধ'রে এনে খাটে শোয়ানো হয়েছে। আপাদমস্তক চাদর দিয়ে ঢাকা।

মুখ খুলে দিতেই সুচারু দেবী শিউরে উঠলেন। দগ্ধ কপালের কোণে বহুদিন আগেকার একটা কাটার দাগ এখনও স্পষ্ট রয়েছে, আগুনে পোড়ে নি। সুচারু দেবীর মনে পড়ল—

প্রিয়নাথবাবু একবার গ্রামের মধ্যে কৃষক-বিদ্রোহ তদন্ত করতে গিয়েছিলেন। তাঁর চলন্ত মোটর গ্রামের চাষাচাষীরা দল বেঁধে আক্রমণ করে। সিপাই-বরকন্দাজের লাঠিতে আক্রমণ ব্যর্থ হয়। কিন্তু ছোট একটি চাষার ছেলে দূর থেকে কাস্তে ছুঁড়ে মেরেছিল। প্রিয়নাথবাবুর কপাল থেকে কাস্তের সেই কাটা দাগ আজও মুছে যায় নি। আগুনে পুড়ে ছাই হবার আগে মুছবে না।

১৯৪১

সিলুয়েট

গ্রামের ছেলেমেয়ে-বুড়ো সকলেই দুলালকে ডাকে 'চোর' বোলে আর বনবালাকে বলে 'সর্দ্দারণী'। অকারণে বলে না। পাঁচ থেকে দশ বছরের ছেলেমেয়েদের আর পঞ্চাশ বা তারও বেশী বছরের বুড়োদের এই সম্বোধনে দুলাল বা বনবালা কেউ বিরক্ত হয় না, গা-সহা হয়ে গিয়েছে। 'চোর' ডাক শুনলে দুলালের লজ্জাও হয় না, অহঙ্কারও হয় না। কিন্তু 'সর্দ্দারণী' ডাকে বনবালার বুক ফুলে ওঠে, চলতে চলতে তার সমস্ত শরীর যেন অজ্ঞাতেই দুলতে থাকে গ্রামের পথে, পথের ধূলোকে একটু জোর কোরে মাড়িয়ে যেতেও তার আনন্দ হয়। ঠিক যে দেমাক তা নয়, কতকটা গ্রাম্য বালিকাসুলভ গৌরববোধ।

আম আর লিচু চুরি কোরে খাইয়ে ছেলেমেয়েদের পোষ মানিয়েছে বনবালা, সে এখন সকলের 'দিদি'। তার কথাতে সকলে ওঠে-বসে। গ্রীষ্মকালে বিকেলবেলা সকলকে ডেকে বনবালা বলেঃ 'চল্, হেল্‌তে যাই নদীতে'। ক্ষীণস্রোতা পাগলা নদীর ধারে সকলে জমা হয়। মহানন্দার একটা শাখা, গ্রামের ভেতর দিয়ে বেঁকেচুরে গিয়েছে, গতির কোনো ঠিক নেই। বর্ষার সময় প্রায় এক মাইল জমির উপর দিয়ে গ্রামের কোলে জল আসে, এপার থেকে ওপারের ক্ষীণ রেখা ভিন্ন কিছুই দেখা যায় না। গ্রীষ্মকালে সব শুকিয়ে যায়—সামান্য একটা সরু ফালির মতো জলস্রোত খুসী মতো হেলেদুলে বইতে থাকে। লোকে বলে 'পাগলা'।

পাগ্‌লার খরস্রোতে বালি কেটে কেটে পাড় ধস্‌তে থাকে। তাই নিয়ে কিছুক্ষণ হুটোপাটি চলে। একখণ্ড চিড়খাওয়া মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকে বনবালা হাত মেলে, ধসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বালির উপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীর বুকে, স্রোতের মুখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে মড়ার মতো ভাসতে ভাসতে চলে যায় অনেক দূর। দূরে গিয়ে ডাক দেয় সঙ্গীদের। তারপর চলে নদীর মধ্যে হাত-পা ছোড়া। কারো পেটের তলায় হাত দিয়ে তুলে ধরে' জলের উপর উপুড় কোরে ফেলে বনবালা বলে, 'হাত দিয়ে পানি টান্, গোড় দিয়ে ঠ্যাল্'।

সন্ধ্যা হয়। গ্রামের রাখালরা গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফেরে। শীষ দেয়, গান গায় মেঠো সুরে। ঘাড় হেঁট কোরে কৃষাণরা ফেরে বলদ নিয়ে, কাঁধে হাল। বনবালা ফেরে একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে।

স্বভাব দেখে বোঝবার উপায় নেই বনবালার বয়স তের। চাষার মেয়ে, রং কালো, চোখ গোল গোল। সৌন্দর্য্যের মধ্যে মাথায় একরাশ চুল আর

সবল, সুঠাম দেহ, পাগলা নদীর পাড়ের মতো থাকে থাকে কাটা। সুডৌল লম্বা লম্বা হাত দুলিয়ে, চুলগুলো কাঁধের উপর গেঁট দিয়ে ফেলে, সোজা বনবালা ভিজে কাপড়ে আগে চলে, পিছনে চলে ছেলেমেয়ের দল!

দেহের সুস্পষ্ট কোণ ও রেখাগুলো দেখে মনে হয় বনবালা কোনো ধাতু দিয়ে ছাঁচে গড়া। তাই পিঠ, বুক, কোমর, হাঁটুর সূক্ষ্ম ভাঁজগুলোও এতো স্পষ্ট।

আশপাশ থেকে কিশোর মাহিন্দাররা শীষ দেয়, মাথল দিয়ে মুখ ঢেকে। 'সর্দ্দারণী' বোলে ডাকতে থাকে। রুক্ষভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে মুখ ভেঙচে জিব দেখিয়ে বনবালা আবার পথ চলতে থাকে।

কিশোরী ঠাকুর দানদক্ষিণার থলে কাঁধে কোরে দূর গ্রাম থেকে হাটে ফিরছিলেন, একহাতে একটা ছিন্নমস্তক পাঁঠা! বনবালাকে দেখে কাঁধ থেকে থলেটা নামিয়ে বল্লেন: 'কি গো সর্দ্দারণী, গোছল্ হোলো? পাঁঠাটা নিয়ে চল্ না হাট পর্য্যন্ত, খেয়ে ফিরবি। আঁধারে ফিরতে তোর তো ডর নেই—'

বনবালার ইসারাতে ছেলেমেয়ের দল কিশোরী ঠাকুরকে ঘিরে চেঁচাতে লাগল: 'চুট্‌কি মে বিসমিল্লা, হা আল্লা, হা আল্লা'। ঠাকুর একবার বলির পাঁঠা, একবার প্রসাদের থলে সামলাতে সামলাতে 'ধ্যেৎ, ধ্যেৎ' করতে লাগলেন। বনবালার ডাকে ছেলেমেয়েরা দৌড় দিল।

দ্রুত লাফাতে লাফাতে চলেছে বনবালা। সমস্ত দেহ ঝাঁকুনি লেগে দুলে দুলে উঠছে। মাংস তো না দেহে, যেন জলের ঢেউ, তার উপর ঝড় লেগেছে।

কিশোরী ঠাকুরের দৃষ্টি শরের মতো বিদ্ধ হয়ে রইল ছুটন্ত বনবালার দেহের উপর, পা রইল মাটিতে আবদ্ধ। অন্ধকারে বনবালা অন্তর্ধান করল। ঠাকুরের ছিন্নমস্তক পাঁঠা অজান্তে খসে পড়ল মাটিতে।

নিশুতি রাত। অটল চৌকিদার এখনো হাঁক দিয়ে যায় নি।

জোরে একবার হৈ করে' উঠে 'এ রাজু ভাই' বোলে অটল সুর টানে। গ্রামের নাপিত রাজু। নাম ধরে ডাক দিতে দিতে গ্রামের পথ দিয়ে অটল চৌকিদার হেঁটে চলে যায়। আজ এখনো সে হাঁক দিয়ে যায় নি। অটল হাঁক দিয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত দুলালের শান্তি নেই। খাটিয়াতে শুয়ে ছটফট করে। চৌকিদারের হাঁকে রোজ সাড়া দিতে হবে, দারোগার হুকুম। সাড়া না পেলে তার পরদিন থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে বেত মারবে। তাই একবার উঠছে একবার বসছে দুলাল। স্বস্তি নেই। দূর থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসছে, দুলাল ভাবছে অটলের হাঁক।

অটল হাঁক দিল 'এ দুলা'। দুলাল উত্তর দিয়ে তাকিয়ে রইল বেড়ার ফাঁক দিয়ে। দেখল নীল রঙের একটা কোট গায়ে দিয়ে হেঁটে চলেছে অটল, এক হাতে লাঠি, আর এক হাতে লণ্ঠন। হন্ হন্ করে' সাহেবের কুঠির বাঁক পেরিয়ে গেল, তারপর দূর থেকে ভেসে আসা অটলের হাঁক শুনে দুলাল বুঝলো অটল গরুর হাট পর্য্যন্ত পৌছেচে। কয়েক মিনিটের মধ্যে হাট পেরিয়ে, থানতলার পাশ দিয়ে, আমবাগানের ভেতর দিয়ে তাঁতিপাড়ায় পৌছবে।

চুপিসাড়ে দুলাল ঢুকলো হেঁসেল ঘরে। হাঁড়ি ঝুলছে বেড়ার গায়ে। ভাঙা সরাখানা তুলে উঁকি মারতেই ভেতর থেকে ছোট্ট একটা ইঁদুরের বাচ্চা ছুটে পালাল। পাশ ফিরে দেখল ভাঙা বেড়ার তলায় ঢ্যাঙা কুকুরটার চোখ জ্বলছে।

বাইরে এসে ছোট্ট উঠানের মধ্যে দাঁড়াল দুলাল। পিড়ের উপর বুড়ো তারিণী ঘুমুচ্ছে। কঙ্কালসার বুকখানা উঠছে-নামছে শ্বাসপ্রশ্বাসে। দলাপাকানো পেশীর উপর শিথিল চামড়া ভেদ করে'ও ঠেলে উঠেছে হাতের শিরাগুলো। একটা হাত মাটিতে, আর একটা মাথার পাশ দিয়ে গিয়ে জড়িয়ে রয়েছে

বনবালার চুলের সঙ্গে। বনবালা ঘুমুচ্ছে। আলগোছা চুল ঝুলছে ছেঁচে পর্য্যন্ত। মোটা লাল কাচের চুড়ি পরা সুগোল দু'খানা হাত, একখানা কোলের উপর, আর একখানা পিছনে বুড়ো বাপের হাড়সার বুকের ওপর পড়ে' শ্বাসপ্রশ্বাসের তালে ওঠানামা করছে।

কোমরে থলেটা জড়িয়ে দুলাল বেরিয়ে পড়ল চৌধুরীদের আমবাগানের দিকে।

মালদহ্ জেলা। আমের জন্যে খ্যাত। আমের ঋতুতে গ্রামের চাষারা কাঁচাপাকা আম-কাঁঠাল খেয়েই জীবনধারণ করে। চৌধুরীদের আমবাগান দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল। বাগানের ভেতর দিয়ে পথ, সারি সারি আমগাছ্— দাদভোগ, কিষণভোগ, খিরসাপাত, গোপালভোগ, ফজ্‌লি। অন্ধকার পথ। মাঝে মাঝে বাঁশের মাচা তৈরী করা আছে বাগানের পাহারাদারদের জন্যে। প্রায় পঞ্চাশ গজ অন্তর এক-একটা গাছের মাথায় লণ্ঠন, তার পাশে ডালের সঙ্গে টিন বাঁধা, টিনের দড়ি মাচার সঙ্গে লাগানো। মাচায় শুয়ে পাহারাদাররা রাতে দড়ি টেনে টিন বাজিয়ে বাদুড় তাড়ায়।

হঠাৎ টিনের শব্দ হোতে দুলাল চমকে উঠলো। গুঁড়ি মেরে বসল গাছের পাশে। শব্দ থামতে অন্ধকারে ডাল বেয়ে গাছে চড়ল। শুকনো ডালের মট্‌মট্‌ ভাঙার শব্দে পাহারাদার গলা খাক্‌রি দেয়, দুলাল চুপটি করে' ডালের ডগায় বসে থাকে, নড়ে না। তারপর আবার ওঠে, হাত দিয়ে আমের বোঁটা ধরে খসিয়ে থলিতে রাখে। এক ডাল থেকে আর এক ডালে ঝুঁকতে গিয়ে থলির আম মাটিতে পড়ে যায়। একসঙ্গে আম পড়ার শব্দ শুনে পাহারাদার লণ্ঠন হাতে করে' উঠে এসে গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়, 'গাছে কে?' অন্ধকারে কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না।

কাঁপতে কাঁপতে দুলাল মাটিতে পড়ে বুকে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'হামি জী !'

দুলালের বুদ্ধি আশৈশব এই রকমই। দুলাল চোর, কিন্তু চুরি করবার কারসাজি জানে না। চুরি করে। ধরা পড়ে। মার খায়। স্বীকারও করে। কোনো কিছুতেই ভয় নেই। হাজত ঘর বাড়ী, আর মারের জন্যে পিঠ বাড়িয়েই আছে। সুর করে' কাঁদতেও দেরী হয় না। তার পরক্ষণেই হাসিও তার মুখে বেমানান নয়।

বেধড়ক পিটুনি খেয়ে গোটা দুই আম পেল দুলাল। তাই নিয়ে ঘরে ফিরল। পরদিন আবার চলল মিয়াদের বড়বাগানে। দুলালের এই নৈশ অভিযান বন্ধ থাকে শুধু তার কারাবাসের সময়। আমের সময় আম, তা না হলে ধান, গম, কলাই, মুগ যা পাবে রোজ কিছু কিছু দুলালের ঘরে আনতেই হবে। বৃদ্ধ তারিণী বহুবার তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু দুলাল যেমন ঘর ছাড়েনি, তেমনি স্বভাবও ছাড়ে নি।

ছোটবোন বনবালার কিন্তু এই নিরেট দাদাটির ওপর অগাধ স্নেহ। সে মাঝে মাঝে তাকে চুরি করা ছেড়ে হালচষার বুদ্ধি দেয়। ক্ষেতমজুর হ'লে একটা পেটের খোরাক ত মিলবে! দুলাল দিনের বেলা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়, কিন্তু রাতে তার আর হদিস্ পাওয়া যায় না।

দুলালকে তাই সকলে বলে 'চোর'। তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। দু'দিন আগে হয়তো সে রাতে চৌধুরী বাড়ীর গোলা থেকে ধান চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে মার খেয়েছে, তৃতীয় দিন সকালে চৌধুরী বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে চৌধুরীগিন্নীকে ডেকে বলে: 'দিদি, কাল রেতে কিছু খাইনি দুটো লাহারী দাও।' কোচড় ভর্ত্তি করে' দুলাল মুড়ি নিয়ে ফিরে আসে।

বৃদ্ধ চাষীর ছোট পরিবারের কাহিনী এইখানেই শেষ হ'লো। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। 'চোর ও সর্দ্দারণী'।

গ্রামটির বিবরণ তেমন কিছু জাঁকাল নয়। নাম হরিশ্চন্দ্রপুর। বলাই চৌধুরীর বাড়ী গ্রামের ঠিক মধ্যে। বাইরে কাছারী বাড়ী, তারপর অন্দরমহল। খিড়কির দরজার সঙ্গে লাগানো একটা ছোট আমবাগান। বাগানের পাশে ঘোড়ার আস্তাবল, ভেড়া ও গরুর গোয়ালঘর। পাশ দিয়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পথ। চারিদিকে সব মুসলমান চাষাদের খড়ের ঘর, প্রায় গোটা পঞ্চাশ ষাট হবে। পশ্চিম দিকে সাহেবের বাংলো, অনেকখানি জায়গা জুড়ে আম ও ফুলের বাগান। বাংলো বছরে একমাস ছাড়া সব সময়ই খালি থাকে। তারপর গরুর হাট পার হয়ে গ্রামের হাট। হাটের মাঝখানে লম্বা টিনের চালা, দু'পাশে একতালা ছোট ছোট পাকা বাড়ি। একঘর ব্রাহ্মণ ভিন্ন বাকি সব ময়রা, বেণে, তাঁতিদের দোকান ও বাসঘর। হাটের শেষপ্রান্তে পশ্চিম দিকে যাত্রাক্লাব, সামনে বিরাট একটা ঝুরিনামা বটগাছ, গ্রামের দেবতার আস্তানা, নাম থানতলা। বটের ঝুরিতে ইট বাঁধা, গ্রামের মেয়েদের, হিন্দু মুসলমান সকলেরই পুত্র কামনার অনাড়ম্বর প্রতীক। বটের গুঁড়িতে বহুদিনের সঞ্চিত তেলসিঁদুরের পুরু প্রলেপের মধ্যে গ্রামের দেবতা বাঁশরী ঠাকুর বিরাজ করছেন।

জেলার বড় বড় রাজা জমিদারদের জমিদারী তত্ত্বাবধানের ভার নয়নপুর জমিদারী কোম্পানি লিমিটেডের ওপর। পদ্মার ওপারে মুর্শিদাবাদ জেলায় ম্যানেজারের অফিস। কোনো কোনো জায়গায় ছোট ছোট কেন্দ্র আছে, সেখানে বাংলো আছে। বছরে ম্যানেজার সাহেব একবার যান খাজনা

আদায়ের সময়। থাকেন এক সপ্তাহের বেশী নয়। তার মধ্যে তিন দিন যায় 'সেলামী' আর 'নজর' নিতে। সাহেব ও আমলাদের আহারও যোগাতে হয় গ্রামের চাষাদের। স্থানীয় পত্তনিদার বা গাঁথিদার একবার শুধু মোটা 'নজর' পৌছে দিয়েই খালাস। বাকি প্রত্যেক দিন মুর্গী, পাঁঠা, মাছ, দুধ, দই সব সেরা সেরা খাবার বাছাই করে' হাজির করতে হবে চাষাদের।

সাহেব আসার আগে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় গ্রামে। বাংলো রং করা, স্প্রিংএর খাট, গদি, অন্যান্য আসবাবপত্র ঝাড়পোঁছ, টানাপাখার ঝুলঝাড়া, দড়ি টাঙানো, সব ব্যস্তভাবে চলতে থাকে। বৃদ্ধ মালীরা খুরপা নিয়ে দিনরাত ঘাস নিড়োতে থাকে, ফুলগাছে জল ঢালে। বিশ্রাম নেই। সাহেব আসবে, খোঁড়া সাহেব, মেম নেই, মেজাজ খারাপ।

বলাই চৌধুরীর অবর্ত্তমানে প্রৌঢ়া চৌধুরীগিন্নী এখন জমিদারী তদারক করেন। বহুদিনের পুরাতন নায়েব ও দফাদার আজও জীবিত, পরামর্শদাতা তারাই। এমনি চৌধুরীগিন্নী খুব বুদ্ধিমতী, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েও তিনি গ্রাম ছেড়ে সহরে যান নি। জমিদারী দেখেছেন, রক্ষা করেছেন, ছেলেদের সহরে শিক্ষা দিয়েছেন, মেয়েদের জাঁক কোরে বিয়েও দিয়েছেন। এক রকম প্রতিবেশীহীন অবস্থায় মুসলমান প্রজা পরিবেষ্টিত হয়ে থেকেও তিনি হিন্দু বোলে ভয় পান নি। প্রজাদের তিনি প্রায় সকলকেই চেনেন। সকলেরই তিনি 'চাচি', এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় থানতলার বাঁশরী ঠাকুরের বেদীতে গরুর হাড় পড়লেও, গ্রামের হাটের দোকান লুট হ'লেও, অসহায় রাজবংশীদের ওপর জুলুম হ'লেও, চৌধুরী বাড়ীর চতুঃসীমানার মধ্যে একটা ঢিলও পড়েনি।

কানাই চৌধুরী তিনবার বি. এ. ফেল করে' বিদ্যাশিক্ষা শেষ করে' গ্রামে জমিদারী দেখছে আজকাল। বড়ভাই নিমাই চৌধুরী উকিল, কলকাতায় থাকে। মাঝে মাঝে গ্রামে ফেরে স্টেশন থেকে সেলাম পাবার লোভে, আর কাছারী ঘরে বসে চাষাদের জুতোপেটা করে' বকেয়া খাজনা আদায় করার পুলক উপভোগের জন্যে। সেই কয়েক দিনের নিমাই চৌধুরীর উগ্রমূর্ত্তি কোম্পানির খোঁড়া ম্যানেজার সাহেবকেও হার মানায়। চৌধুরীগিন্নী আজকাল কিছুই বলেন না, চাষারা এসে নালিশ করলে বলেন, 'এখন বাছা, ছেলেরা বড় হয়েছে, ওদের ওপর আমি কি কথা বলতে পারি?' ছেলেদের জন্যে তিনি গর্ব্ব অনুভব করেন, ভাবেন দেশের ওপর তাদের টান আছে, কর্ত্তার জমিদারী রক্ষা হ'লেও হ'তে পারে।

চৌধুরীবাড়ী কাজ করে বনবালা। কাজ তার সকাল সন্ধ্যায় গরু দোয়া, গোয়ালঘর পরিষ্কার করা আর গরুদের খেতে দেওয়া। সকালে চৌধুরীবাড়ী কারও ঘুম ভাঙবার আগেই তার কাজ শেষ হয়ে যায়। দুপুরে মাঠে বুড়ো বাপের খাবার বয়ে নিয়ে যায়, সন্ধ্যার আগে ফিরে আসে ঘাসের বোঝা মাথায় করে', পিছনে আসে বৃদ্ধ তারিণী লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে। বনবালার 'দহরমা' (মাইনা) থেকে তাদের তিন বিঘে জমির বাৎসরিক খাজনার চার ভাগের একভাগ কাটা যায়, নগদ মেলে শুধু একখানা কাপড় আর গামছা, আর কোনো কোনো দিন চাল-নুন ধার, এই পর্য্যন্ত।

বনবালার বয়স এখন পনেরো। কালো সবল দেহের ভাঁজগুলো স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়েছে। দেহের ভার বেড়েছে। চলার মধ্যে পাঁচ বছর আগেকার চাঞ্চল্য না থাকলেও কিসের এক অদ্ভুত সাবলীলতা সে অনুভব করে। গ্রামের মোড়ল খোস্‌বর দিয়া 'বোহিন্‌' বোলে ডেকে আজকাল বেশীক্ষণ কথা বলতে

চায়, হাটের মাঝখানেও বিনোদ তাঁতী একখানা কোরা শাড়ী 'পয়সা যবে হোক্ দিয়ে যাস্' বলে' তার হাতে গুঁজে দিতে দ্বিধা বোধ করে না, সত্যনারায়ণ ও লক্ষ্মী পূজোর প্রসাদ নেবার জন্যে কিশোরী ঠাকুর তাকে প্রায়ই রাতে হাটে আসতে বলে, যাত্রা ক্লাবের মাস্টার থানতলায় হঠাৎ কোনোদিন দেখা হ'লেও বলতে ভোলে না, 'সহরে গেলে তোকে থিয়েটারে নিয়ে নেবে বনো, দহরমা পাবি', ধীরু ময়রা বাসি খাবারের ঠোঙা তার হাতেই ডেকে তুলে দিয়ে বলে 'পয়সা লাগবে না', বৃদ্ধ মালী ঝড়ুমিয়াও দাড়িতে হাত দিয়ে বিদ্রূপ করে' বলে, 'হামাকে নিকা করবি সর্দ্দারণী'—

চারিদিক থেকে করুণা ও বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ হয়ে বনবালা অস্বস্তি বোধ করে। দারিদ্র্য দেহ বেচতে হুকুম দেয়, বনবালা শিউরে ওঠে। অন্ধকারে পথ চলতে তার গা ছম্ ছম্ করে। একা মাঠের মধ্যে মানুষ দেখলে সে জড়সড় হয়ে যায়। এমন তার কখনো হয় নি।

পাগলা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে তার মনে পড়ে দু'বছর আগেকার কথা। নদীর পাড়ে পিড়ির ওপর আছাড় দিয়ে বনবালা কাপড় কাচে, দূরে হাটের বাবুরা নেমে 'কেলি' আর 'হল্লা' করেন। ড্যাবা ড্যাবা আট দশ জোড়া চোখ বনবালার দেহের নিটোল ভারাক্রান্ত পেশীর উপর নিবদ্ধ থাকে। শীকারের হরিণ যেন বনবালা। আড়চোখে ভ্রূ তুলে' একবার চেয়ে দেখে, বুক থেকে কাপড় টেনে কোমরে জড়িয়ে আবার কাপড় কাচতে আরম্ভ করে। ডুব সাঁতার দিয়ে আধপোয়া প্যাঁড়ার বাজি রেখে ধীরু ময়রা বনবালার পা জড়িয়ে ধরে' দাঁত বার করে' হেসে ওঠে, দূরে থেকে হাসির ফোয়ারা ছোটে। গায়ে জল ছিটিয়ে গাল দিতে দিতে বনবালা কাপড়চোপড় নিয়ে পিড়ি মাথায়

করে' অন্য ঘাটের দিকে চলে যায়। পরদিন আর হাটের ঘাটমুখো হয় না।

পথচলা দায়। চারিদিকে সকলে যেন ওৎ পেতে বসে আছে। পথ চলতে শরীর টন্ টন্ করে, আর বনবালা ভাবে সে কি ময়রার দোকানের খাবার যে ছোঁ মারতে হবে, 'বেহুদ্দা সব'। তবু কেন যে শরীরের রক্ত এমন চঞ্চল হয়, হাঁটতে কেন যে গায়ে দোলা লাগে ? ছন্দায়িত দেহে সোজা হেঁটে চলে বনবালা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গর্ব্বিত আন্দোলনে মনে হয় 'সর্দ্দারণীই তো!' হাতে এখন তার একজোড়া মোটা রূপোর বালা। বালা দু'টোর দিকে চেয়ে মনে পড়ে সেদিন রাতে কিশোরী ঠাকুরের কথা। হাট থেকে সে ফিরছিল ঠাকুরের বাড়ী থেকে প্রসাদ নিয়ে, সঙ্গে আসছিল কিশোরী ঠাকুর লণ্ঠন নিয়ে চৌধুরীদের বাড়ী। সাহেবের বাংলোর পাশে ছাতিম তলায় গাছ থেকে শুক্‌নো একটা ঢ্যালা পড়তেই লণ্ঠন ফেলে কিশোরী ঠাকুর 'দুর্গা' নাম জপ্‌তে জপ্‌তে জাপ্‌টে ধরেছিল বন-বালাকে। ভূতের ভয়ে 'দুর্গা' নাম ভুলে গিয়ে ঠাকুর কেবল ফিস্ ফিস্ করে' বলেন 'বনো, বনো'—অন্ধকারে শুধু ফিস্ ফিস্ শব্দ হয়। বনবালা ঝাপ্‌টা দিয়ে বলে, 'লক্ কোরে থাক ঠাকুর'। ঠাকুর শুধ্ ফিস্ ফিস্ করে আর কাঁপে। ঠাকুরের ভূত বনবালার দেহের ওপর ভর করতে চায়। হাতের বালা ঘুরিয়ে বনবালা ঠাকুরের কপালে সজোরে একটা ঘা মারতেই, ঠাকুর 'উঃ' শব্দ করে' এক হাত কপালে দিয়ে আর এক হাতে লণ্ঠন কুড়িয়ে নিয়ে হাটের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরতে থাকে। বনবালা হাতের বালার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবে, এতেই হবে, একটা কিশোরী ঠাকুর, একটা ধীরু-ময়রা, এতেই হবে।

তাঁতীপাড়ার পথে বিনোদ তাঁতী বনবালাকে একখানা গামছা দিয়ে এক ঘণ্টা ধরে' ভাঙা নীলকুঠির পাশে দাঁড়িয়ে সহরের গল্প শুনিয়ে দেয়। অর্দ্ধোদয়

যোগে সে সহর দেখে ফিরেছে, খরচাও করেছে প্রায় চার কুড়ি টাকা। বিজ্‌লী বাতি, দোতলা মটরগাড়ী, হোটেল, থিয়েটার আর হরেক রকমের মানুষের বাস—বিনোদ তাঁতী চক্ষু বিস্ফারিত করে' বলে' যায়, বনবালা শোনে। শুধু তাই নয়, বড়ো বড়ো লোহালক্কড়ের, পাটের, কাপড়ের কল কারখানা—এক ঘণ্টায় কতো জিনিষ তৈরী হচ্ছে—হাল চষে বা ঘরে হাতে যা দু' বছরেও হবে না।

তাজ্জব দেশ—বনবালা ভাবে। কালো কালো ভ্রূ জোড়ার তলা দিয়ে চোখের নিবিড় কালো মণি দুটো পোড়ো নীলকুঠির গায়ের বটঅশথের ভেতর দিয়ে দূরে নীল আকাশের কোলে কোন্ এক অজানা মানুষের স্বপ্নের দেশ খুঁজে বেড়ায়।—

যাত্রা ক্লাবের মাস্টার থানতলায় তাকে রোজই একবার শুনিয়ে দেয়—'সহরে তোকে থিয়েটারের দলে নিয়ে নেবে, বনো—মোটা দহ্‌রমা পাবি'—

ছোটবাবু রোজ সন্ধ্যায় আম বাগানে পায়চারি করতে করতে শীষ দেন, তারপর এগিয়ে আসেন গোয়াল ঘরের দিকে। দুল্‌তে দুল্‌তে বলেন বনবালাকে সম্বোধন করে', 'সহর দেখেছিস বনো, কলকাতা? সহর না দেখ্‌লে তো মায়ের গর্ভেই আছিস্ রে!" বনবালা ঘাড় নেড়ে জানায় যে সে মায়ের গর্ভেই আছে। মুখ তুলে' চায় না। কানাই চৌধুরী একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গরু-দোহনরতা বনবালার আন্দোলিত হাত পিঠের দিকে চেয়ে বলেন: 'দুলালকে হাল চষতে বলিস্ না কেন? চুরি করে' কদ্দিন চল্‌বে? বুড়ো বাপকে এমন করে' খাটাতে তোদের সরম হয় না রে?' ভ্রূ তুলে বনবালা একবার ছোটবাবুর দিকে আড়চোখে চায়। ছোটবাবু বলেন: 'এক কাজ কর বনো। হাস আর ছাগল পোষ। হাসের ডিম

বেচ্‌বি, আর একটা খাসিরও দাম কম নয়। দেখবি, তোদের দিন ফিরে যাবে—জমি কিনবি, ঘর তুল্‌বি।'—গরুর পায়ের দড়ি খুলে দিয়ে দুধের কেঁড়ে নিয়ে ভিতরে চলে যায় বনবালা।

এমনি রোজ নানারকম কথা শোনে বনবালা। ঘরে অন্ন নেই। মাঠে ফসল ফলে না। যা ফলে তা বাবুদের খামার থেকে বাবুদেরই গোলাতে ওঠে। তিনটে পেট—দুই ভাই বোন, বুড়ো বাপ—তার ওপর হাঁস আর পাঁঠা। এমন 'দিল্‌লাগি' না করলেই নয়!

ছোটবাবুও অন্য কথা ছেড়ে আজকাল বলেন, 'বালা পরিস্‌ কেন? ছেঁড়াকাপড় পরিস্‌ কেন?' বেড়ার পাশে গিয়ে হাতে ক'টা টাকা গুঁজে দিয়ে বলেন, 'কাউকে বলিস্‌ না, সরু সরু চুড়ি গড়াবি, নোতুন কাপড় কিন্‌বি হাট থেকে।'—টাকা ছুঁড়ে ফেলে দেয় না বনবালা, হাতে মোটা বালার দিকে চেয়ে চেয়ে ঘাড় নীচু কোরে থাকে। চোখে জল আসে। ভয় হয়। বুক দুর্‌ দুর্‌ করে। সাহস হয় না বালা দিয়ে কপালে ঘা মারতে। ছোটবাবু ভাল লোক, বেহুদ্দা নয়। ভুতের ভয় নেই।

অন্ধকার গোয়াল ঘরে ঘাড়ে যদি ভূত চাপে? 'বনো, বনো'—ফিস্‌ ফিস্‌ শব্দ হয়? বড় লোকের কি ভয় আছে? ভয়ে যদি ঝাপ্‌টে ধরে? ফিস্‌ ফিস্‌ ফিস্‌। গোয়ালঘরে ধুনো দিতে দিতে বনবালা বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাগানের দিকে চেয়ে দেখে ছোটবাবু শীষ দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। আড়ষ্ট হয়ে গোয়ালঘরে সে এককোণে দাঁড়িয়ে থাকে।

'বন—বালা'—অন্ধকারে ফিস্‌ ফিস্‌ শব্দ। 'ব-নো'—সেই ফিস্‌ ফিস্‌। মশার কামড়ে গরু খুর ঠুক্‌ছে। অন্ধকারে গরুর চোনা আর ধুনোর গন্ধ গোয়ালে, আর ফিস্‌ ফিস্‌ শব্দ। ফিস্‌ ফিস্‌ ফিস্‌—

রাতে পিড়েতে উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে বনবালা। পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ তারিণী নানা কথা জিজ্ঞাসা করে, বনবালা জবাব দেয় না, ফুঁপিয়ে ওঠে। হেঁসো হাতে করে' দুলাল তেরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করে কেউ বেহুদ্দাপনা করেছে কি না, তা হ'লে সে হেঁসো দিয়ে তার পেট ফাঁসিয়ে আজ রাতেই মুণ্ডু নিয়ে আসবে হাড়িতে করে'। বনবালা জবাব দেয় না। ভাঙা চালা ঘরের পিড়েতে শুয়ে শুয়ে কাঁদে। আলুথালু চুল আর চোখের জলে ফোলা-ফোলা মুখের দিকে চেয়ে বুড়ো তারিণীর চোখেও জল আসে।

বনবালা বলেছে কাজ সে করবে না চৌধুরী বাড়ী, গাঁয়ে থাকবে না, দুলাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা সহরে যাবে। দুলাল বলেছেঃ 'ডর কি বোন্! শালার গাঁয়ে থাকলে চুরি করে' হাজত যেতে হবে। সহরে কল চালিয়ে গাঁয়ে জমি কিন্‌ব, ঘর তুল্‌ব, ক্ষেতে মজুর লাগিয়ে চাষ করব—তবে ফিরব।' 'চোর' দুলাল 'নবাব' হবার স্বপ্ন দেখে। বনবালা ভাবে কলে কাজ না জুটলে যাত্রার মাস্টার বলেছে থিয়েটার আছে।

তারিণীর মাত্র তিন বিঘে ভুঁই। তাও ভাগচাষের বন্দোবস্ত। যা ফসল ফলে চৌধুরীদের খামারে তুলে দিয়ে আসতে হয়। ঘরে যা আসে তাতে তাদের একবেলারও খোরাক্ হয় না। তবু বীজধান আর কলাই আনতে তারিণী রোজ ধন্না দেয় চৌধুরী বাড়ীতে, নায়েবের পা জড়িয়ে ধরে' কান্নাকাটি করে।

বনবালা বুড়ো বাপের বুকে হাত বুলোতে বুলোতে কতো বোঝায়—কি হবে তিন বিঘে ভুঁই—বুড়ো বয়সে হালচাষ করে'—গাঁ ছেড়ে সহরে গিয়ে তারা দুই ভাইবোন কলের মজুর হবে আর সে শুয়ে শুয়ে খাবে। বুড়ো বাপ

কিন্তু বোঝে না, সহরে কিসের কাজ, কেন যাবে, কিসের কল, বনবালাকে কে খোঁজ দিয়েছে, কিছুই জানে না। বার বার বলে, 'দেশের ভিটে ছেড়ে মেলেচ্ছ সহরে কেন যাবি বেটী! বুড়ো বাপ, দেশের ভূঁই—ভূঁই ছাড়তে নেই, ভগবানের কীরে, ভূঁই ছেড়ে যাস্ নি বেটী!'

ভগবান? ভূঁই? ভিটে?

যে ভগবান মানুষের দুঃখে কাঁদে না তার শক্তিকে বনবালা ভয় করে, কিন্তু তাকে ভালবাসে না। যে ভিটেতে সাহেবের লোকে বছরে দু'বার করে' আগুন জ্বালিয়ে দেয়, সে ভিটের ওপর তার মায়া নেই। যে ভূঁই তাদের পেট ভরাতে পারে না, সে-ভূঁই ভূঁই না শ্মশান!

তারিণী বুড়োর ছোট্ট পরিবারে ভাঙন ধরল। ভূঁই রইল, ভাঙা কুঁড়ে রইল, ভাঙল শুধু বুড়ো তারিণীর মাটির স্বপ্ন-সৌধ—মাটির মায়াপুরী—

চৌধুরীদের গোয়ালঘরের দিকে বনবালা একবার ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখল অন্ধকার, ভেতরে এখনো ফিসফিস শব্দ হোচ্ছে। রাঙীর বাছুরটা ডাকছে।

হাটের পথ—খোসবর মিয়া ডাকে 'বোহিন,' ঝড়ুমালী বলে 'সর্দ্দারণী'। ঐ কিশোরী ঠাকুরের ঘরে আলো জ্বলছে, ভোররাতে পূজো করছে ঠাকুর। সেই স্নানের ঘাট। মনে পড়ে গাঁয়ের ছেলেমেয়ে নিয়ে 'হেলার' কথা। থানতলা, যাত্রা ক্লাব—'সহরে গেলে তোকে থিয়েটারে নিয়ে নেবে বনো'। চৌধুরীদের আম বাগান—দুলালের মনে পড়ে আম চুরি। ধানের ক্ষেত সারি সারি, জহর মিয়ার আল পার হয়ে, গফুর মিয়ার আল পার হয়ে তাদের সেই তিন বিঘে জমি, ধূ ধূ করছে। বনবালার বুক ফেটে চোখে জল আসে। ঝরঝর করে' গাল বেয়ে জল পড়ে, ক্ষেতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে বিহ্বল হয়ে।

চারিদিকে ধূ ধূ করছে মাঠ। শেষ রাত্রির ঝিরঝিরে হাওয়ায় বনবালার চুল উড়ছে। মনে পড়ছে বুড়ো বাপের কথা—দেশের ভূঁই ভগবানের কীরে—

লালাপাড়ার সুদখোর লালারা ঘুমুচ্ছে। সুদের আমেজ এক প্রহর বেলায় কাটে। মিয়াপাড়ার মুর্গী ডাকছে। তেঘরিয়ার বাজার—মহানন্দা নদী—খেয়াঘাট—ওপারে নবাবগঞ্জ স্টেশন।

হামার বেটীকে দেখেছ জী? ভোরবেলা গ্রামের পথে পথে লাঙ্গল কাঁধে চাষাদের কাছে বৃদ্ধ তারিণী জিজ্ঞাসা করে। রাতে বনবালার অন্তর্ধানের কথা শুনে সকলে বলে, 'বদমাস্ বেটী, পালাল্ছে।' বেলা হ'তে কিশোরী ঠাকুর হাটময় ছোটলোকের কুৎসার কীর্ত্তি প্রচার করেন। সকলে বলে, চাষার স্বভাবই ঐ'—

শ্লথ পা ফেলে মাঠের দিকে যেতে যেতে তারিণী বুড়ো বলে: বেইমান! বেইমান কুণ্ঠেকার! বুড়ো বাপ, সরম নেই, বেইমান!' তিন বিঘে ভূঁইয়ের আলের ওপর বসে' অবসন্ন শিথিল দেহ ভাঙা লাঙ্গলের ওপর ভর দিয়ে বুড়ো তারিণী ডুকরে কেঁদে ওঠে—'বেইমান বেটী'—আকাশের দিকে চেয়ে হাত তুলে কাঁপতে কাঁপতে অভিশাপ দেয়: 'ভগবান! কলঙ্কিনী বেইমান্ বেটি গাঁয়ে না ফেরে, মড়কে মরুক—মরুক—'

ডাকাত—ডাকাত—

ছুটন্ত ট্রেণের কামরায় বসে' দুলাল ভাবছে সে আর ধান চুরি করবে না। সহরে কাজ না পেলে সে ডাকাতি করবে—টাকা, পয়সা, সোনা হীরে। চলন্ত ট্রেণের চাকার শব্দ হোচ্ছে 'ডাকাত—ডাকাত—'

বনবালার চোখে জল। ট্রেণের কামরায় সহরের হট্টগোল—কলের গোঙানি—আর বাইরে ধাবমান গাছপালার মধ্যে—

হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম—চৌধুরী বাড়ী—সাহেবের বাংলো—গোয়াল ঘর—ছাতিমতলা—হাট—কিশোরী ঠাকুর—ছোটবাবু—ক্ষেতের মধ্যে সেই তিন বিঘে ভুঁইয়ের প্রান্তে লাঙ্গল কাঁধে বুড়ো বাপ তারিণী—সবকিছু—

—নীলাকাশ ও খর রৌদ্রের পটভূমিতে চলন্ত ট্রেণে বনবালার চোখের সামনে দুফোঁটা অশ্রুর ভেতর দিয়ে ভেসে ওঠে সিলুয়েট ছবির মতো—কালো কালো অস্পষ্ট রেখাচিত্র—দিগন্তে ক্রমবিলীয়মান—

১৯৪১

নগর-তীর্থ

সামান্য কয়েকটা আঁচড়ে আমাদের এ-জীবনের কতো ছবিই না ফুটিয়ে তোলা যায়! কুকুরের চাইতেও নগণ্য জীবন, পোকামাকড়ের চাইতেও বৈচিত্র্যহীন! তবু তো জীবন! মানুষের!

মানুষ মনে হয়, মানুষ নয়। মানুষের আকৃতিও নেই। ঝামার মতো রুক্ষ চামড়ার তলায় পাথরের মতো শক্ত মাংসের ঢেলা। শিরগুলো পাকানো দড়ির মতো, মনে হয় গিট পড়ে' রক্ত চলাচল বন্ধ করবে বুঝি। স্নায়ুতে জং ধরেছে। তর্জ্জনি স্পর্শে ঝঙ্কার ওঠার দিন হয়তো একদিন ছিল, যখন এরা মানুষ ছিল, যখন রং ছিল এদের চোখে, সুর ছিল এদের মনে। বাইরের

পৃথিবী হাতুড়ি পিটলেও আজ শুধু একটা বিকট ভাঙা আওয়াজ বেরোয়। ফুসফুস দু'টো যেন আগুনের চুল্লী, ঘোলাটে চোখেও তাই আগুনের ফুল্‌কি দেখা যায়। হিংসায় ভরা মন। রক্তলোলুপ বন্য পশু সব।

আমি থাকি সহরের এই অঞ্চলে মাঠকোঠার দোতলার একটা ঘরে। কোঠাটা একটু হেলান, মনে হয় ঝড়ে উপ্‌ড়ে পড়বে। নীচের তলায় একটা মুদির দোকান। পাশে একটা রুটির দোকান, রাতে নিয়মিত আমার ছ'খানা করে' রুটি খাবার বন্দোবস্ত এখানে। সিঁড়ির ধারে চা'য়ের দোকান, 'গোলাপী কেবিন'।

'গোলাপী কেবিনের' ছোট্ট একটু ইতিহাস, এই ছবির নানারঙের একটা রঙ। প্রোপ্রাইটর নিমাইচরণের স্ত্রী গোলাপী বড়ো ঝাঁঝাল মেয়েমানুষ। যেমন ছিল তার তেজ, তেমনি দম্ভ। তাড়ি খেয়ে নিমাইচরণ যে কয়দিন বেয়াদপি করেছে ঘরে ফিরে, ঠাস্ ঠাস্ করে' গালে চড় মেরে এক-একটি দাঁত ভেঙে দিয়েছে গোলাপী। ভেউ ভেউ করে' কুকুরের মতো কেঁদেছে নিমাই-চরণ, পায়ে ধরেছে গোলাপীর, গোলাপীর মন গলেনি। একদিন যখন গোলাপীর দু'গাছা চুড়িতে টান পড়ল, ধস্তাধস্তি হ'লো, গোলাপী সজোরে নিমাইচরণের মাথায় ঘটির একটা বাড়ি বসিয়ে দিয়ে সেই যে বাপের বাড়ী চলে' গেল, আর আসে নি। দু'দিন পরে মাথায় পট্টি বেঁধে, রাস্তায় মান ভাঙানোর নানারকম ফিকির করে', নিমাইচরণ যখন শ্বশুরালয়ে পৌছল, তখন গোলাপীর জলেডোবা ফোলা মৃতদেহ পুকুর থেকে ঘরের পিঁড়েয় তোলা হয়েছে। একবার শুধু তার ভ্যাপ্‌শা মুখের দিকে চেয়ে নিমাইচরণ ফিরে এসেছে নিজের ঘরে। তারপরেই নবাব নিমাইচরণের মমতাজবিবি গোলাপীর

স্মৃতিরক্ষার্থে এই 'তাজমহল'। পৃথিবীর ইতিহাসে না হোক্, আশপাশের বস্তির বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাসে, গোলাপী কেবিনের ক্যানেস্তারার ভাঙা চেয়ারে, ছেঁড়া চাটাইয়ে, ছোট ছোট কাচের গ্লাসে, মাটির খুরিতে, এক পয়সার রুটিতে, চা'য়ে আর তাড়ির গন্ধে, নিমাইচরণের 'প্রেম' নিত্য নূতন অমরত্ব লাভ করে। কেবিনের ঝাঁপ বন্ধ করে' দিয়ে এখনো গভীর রাতে মধ্যে মধ্যে নিমাইচরণ তাড়ির মাত্রাধিক্যে গোলাপীর হাতের ঠোণা খাওয়ার জন্যে বিনিয়ে বিনিয়ে নাম ধরে কাঁদে।

সকলে তখন ঘুমোয়। বিনিদ্র চোখ দু'টো আমার ছোট জানালার ফাঁক দিয়ে তারায়-ভরা উদাস আকাশের দিকে নিবদ্ধ থাকলেও, কান আমার শুধু কান্নাই শোনে।

আমার পাশের ঘরে একজন 'এজেণ্ট' থাকেন। দরজার সামনে পিচবোর্ডের উপর কালি দিয়ে লেখা—'হরিহর গণ, এজেণ্ট'। এঁর সঙ্গে আমার আলাপের একটু ইতিহাস আছে। মধ্যে মধ্যে খুব ভোরে এঁর ঘর থেকে শুনি হার্মোনিয়মের শব্দ, সুরের আলাপ। তন্দ্রার ঘোরে সঙ্গীতের বাণী কোনদিন মন দিয়ে শুনিনি। ঘুম থেকে উঠে ঘর দেখি তালাবন্ধ। তারপর নিজের কাজে বেরিয়ে যাই সারাদিন, দেখা হয় না, রাতে 'এজেণ্ট' কখন ঘরে ফেরেন জানি না। একদিন হঠাৎ সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখি, এজেণ্টের ঘরের দরজা বন্ধ, ভিতরে ঘুঙুরের শব্দ হোচ্ছে, নাচের তালে তালে। শুনে থমকে দাঁড়ালাম। দরজায় করাঘাত করতেই যিনি খিল খুলে' সামনে দাঁড়ালেন, ইনিই যে 'এজেণ্ট' ইতিপূর্ব্বে কল্পনাও করতে পারি নি। নারীর বেশ ও হাবভাব, পুরুষের স্বর ও আকৃতি। পায়ে ঘুঙুর। হার্মোনিয়াম গলায় ঝুলবার জন্যে প্রস্তুত। বললাম, 'আপনিই কি এজেণ্ট?'

কর্কশকণ্ঠে জবাব এল, 'হ্যাঁ, মাজন চান? বগলাবাবুর দাঁতের মাজন—দাঁত দিয়ে রক্তপরা, পুঁজ পরা, দাঁতের গোড়া কন্ কন্ করা, বদ্হজম, মুখের গন্ধ, দাঁতের কোটিং, মাড়ি ফোলা, দন্তশূল, দাঁতের গোড়া নরা—' নিশ্বাস তখনও ফুরোয়নি। বললাম, 'থাক্ এখন, পরে হবে'। আবার একবার দম নিয়ে হরিবাবু বলতে লাগলেন, 'কি করব স্যর! ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পরেছি, দেশে মা আছে বোন আছে বিবাহযোগ্যা, ভাই আছে, ঘরে খাবার নেই, ব্যাকার! ভিক্ষে করলে কেউ দেয় না বোলে সং সেজে খাচ্ছি—নিন্ না স্যর দু'টো ভাল জিনিষ, দাঁতের গোরা—'। বাধা দিয়ে বললাম, থাক্। কাঠের পুতুলের মতো কথাগুলো শুনে, দু' প্যাকেট মাজনের দাম দিয়ে চলে এলাম কলের মতো সোজা ঘরে। সঙ্ না সাজলে যে সহরে ভাত জোটে না, আমার এ-কথাটা বোধ হয় গণ মশাইয়ের কানে পৌছয়নি।

মাঠকোঠার দোতলার দক্ষিণ দিকে দেড় হাত চওড়া একটা কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা বারান্দা। সামনে হাত দশেক জমি পার হয়েই রাস্তা। রাস্তার ওপারে বড় বড় বাড়ী। সন্ধ্যা হোলেই অর্গ্যান, রেডিও আর গ্রামোফোনের ঐক্যতান স্থরু হয়। মাত্র বিশ হাত চওড়া একটা রাস্তার ব্যবধান, এদিক আর ওদিক। অথচ আমরা যেন বিশ হাজার মাইল দূরে সহর থেকে বিচ্ছিন্ন। কোনদিক থেকে কিছুরই মিল নেই রাস্তার এপারের সঙ্গে ওপারের।

উত্তরদিকে ভিতরে একটা দু'হাত চওড়া বারান্দা। এক কোণে কাঠের সিঁড়িটা বারান্দা থেকে জমির সঙ্গে লাগানো। ভিতরের এই বারান্দায় দাঁড়ালে একটা মাঠ চোখে পড়ে, তাও অনেক দূরে। মধ্যে প্রায় তিনশ' গজ জায়গা জুড়ে বৃত্তাকারে বস্তি। কতকগুলো খোলার ঘিন্‌জি ঘর যেন

মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে' রয়েছে মাঠকোঠার কোল ঘেঁষে। এই বারান্দায় দাঁড়ালে অনেকগুলো ঘরের 'অন্দর' পর্য্যন্ত দেখা যায়।

কিছুদিন আগে, আজও মনে আছে আমার, উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত জীবনের 'আশা' তখনো ছাড়তে পারি নি, একদিন গিয়েছিলাম চাকরীর উমেদারী করতে একজন উচ্চপদস্থ নগরকর্ত্তার বাড়ী। এই মহানগরীর এই অঞ্চলেরই স্বাস্থ্যরক্ষার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত। তাঁর বাড়ীর একটি কোণে গোয়ালঘর দেখেছিলাম—সিমেণ্ট করা মেঝে, সিমেণ্টের ছোট ছোট দেয়াল তোলা, প্রত্যেকটাতে এক-একটি নাদুশনুদুশ ভাগলপুরী গাই। স্বাস্থ্যের জন্যে ভাগলপুরী গাইয়ের মোটা বাঁটের দুধ খুব উপকারী নিশ্চয়ই।

বস্তির ঘরগুলো গোয়ালঘরের তিনভাগের একভাগ। সামনে একটা মানুষের দৈর্ঘ্যের সমান একটুকরো ঘেরা পিঁড়ে, তারই একদিকে হাঁড়িকুড়ি, একদিকে দেয়ালের গায়ে ঠেস্ দেওয়া দড়ির খাটিয়া। প্রত্যেক ঘরে দু'জন থেকে চারজন বাসিন্দা। বাসিন্দারা ধাঙড়, ময়লাফেলা কুলি, ঝাড়ুদার ইত্যাদি। সহরের আবর্জ্জনা প্রত্যহ ধুয়ে মুছে, ঝাঁট দিয়ে, কোদাল টেনে সাফ করা এদের কাজ। শোনা যায়, এ-কাজ নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যেই।

ভাগলপুরী গাইয়ের মোটা বাঁট দিয়ে দুধ ঝরে না এখানে। এক কোণে একটা তিন হাত লম্বা কল আছে, প্রায় তিনশ' ছেলেমেয়ে বুড়োর জন্যে সকালে বিকেলে চার ঘণ্টা করে' তারই সরু নল দিয়ে ক্ষীণধারায় জল ঝরে। ড্রেণের শিশুরা মাথায় মুখে ময়লা মেখে এসে তারই তলায় মহানন্দে গড়াগড়ি দেয়, নলটা মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে টান মেরে জল বার করে' তৃষ্ণা দূর করে। মা-বোনেরা অনাবৃত হয়ে পিঠ-বুক—মাথা ভিজিয়ে স্নান করে। কলের সোজাসুজি

রাস্তার কোণটিতে এই সময় গ্যাসের তলায় ও বিড়ির দোকানের বেঞ্চিতে ভিড় জমে। একটু-আধটু গজল গানও চলতে থাকে।

বুধন ধাঙড় এই বস্তিরই একটা ঘরের মালিক। মালিক মানে বাসিন্দা। বুধন ময়লাফেলা গাড়ীর কুলি। মেয়ে দরিয়া ঝাড়ু হাতে, আলো আঁধারের সন্ধিক্ষণে, প্রত্যুষে, রাস্তা ঝাঁট দিতে বেরিয়ে যায়। নির্দ্দিষ্ট রাস্তার কোণে ছোট একটি বকুলগাছের তলায় ভঞ্জু ধাঙড় চুপটি করে' বসে' থাকে। দরিয়া দুলতে দুলতে যায়।

বুধন কোদাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকে লরির প্রত্যাশায়। গাল দেয় দরিয়াকে। দিনরাত দরিয়ার বিরুদ্ধে সকলের অভিযোগে বুধন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এক-দিন কাজে না গেলে ভঞ্জু ঘরের পাশে এসে শিষ দেয়, ব্লক সর্দ্দার দরিয়ার ঘরের পিঁড়েতে বসে' বিড়ি টানে। জিলা ইঞ্জিনিয়ারবাবুর বাড়ীতে দরিয়া উপরি কাজ পায়। ইঞ্জিনিয়ারবাবুর মাতৃহীন ছেলেমেয়েদের পেরাম্বুলেটরে করে' দরিয়াকে বেড়াতেও দেখেছে অনেকে। দরিয়ার জন্যে এতো কেন?

বৃদ্ধ বুধন গাল দেয়, লাঠি নিয়ে মারতে যায়। লাঠি কেড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় দরিয়া। বস্তির সকলে ভিড় করে। এমন দৃশ্য নিত্যনৈমিত্তিক। মাঠকোঠার ঘর থেকে আমি দেখি আর শুনি। এক-একদিন রাতে দরিয়া গলাছেড়ে কাঁদে তার মায়ের জন্যে। বৃদ্ধ বুধনও কাঁদে মুনিয়ার জন্যে।

বুধনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় অপ্রত্যাশিত ভাবে।

মাতাল নই, তবু মদ খাই আমি। চারিদিক থেকে দিনের পর দিন অকারণে সকলের যে-অভিযোগ আমার উপর স্তূপীকৃত হয়, তারই পচা

দুর্গন্ধের কবল থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। মুক্তি পাই না, লোহার শিকলে বাঁধা পড়ি। তাই অসহায় শিশুর মতো মদের গন্ধে এই সব বিকলাঙ্গ জীবনের পর্ব্বতপ্রমাণ নালিশের বিকট গন্ধ আমি ঢেকে দিতে চাই। দুঃসাহস আমার! সহরের সমস্ত আবর্জ্জনা ও ড্রেণের বীভৎস গন্ধ যে-নালিশের উগ্র দুর্গন্ধের তলায় পড়ে' কাঁদে, তাকে আমি উবিয়ে দিতে চাই কোহল-গন্ধে!

এখান থেকে খানিকটা দূরে একটা দিশী মদের দোকান। লোকের ভিড় হয় খুব। দোকানের দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা হলঘর। পাশে ছোট দু'টো ঘরে কাঠের টেবিল আর বেঞ্চি পাতা। হলের মধ্যে বসবার কিছু নেই, খালি মদের পিপে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। একটু এগিয়েই মদ বিক্রীর কাউণ্টার। বোতলের আর মদ ঢালার বগ্ বগ্, ধুপ ধাপ শব্দ। তারই ধার দিয়ে একটা ঘুপটি সিঁড়ি, দোতলায় ওঠার। উপর নীচে একই বন্দোবস্ত। দোকানের ভিতর ঢুকলেই পল্লীগ্রামের দশটি হাটের হৈ হৈ আওয়াজ শোনা যায়। পিপের উপর, মেঝেতে, বেঞ্চিতে, এক পয়সার পিঁয়াজি না হয় ছোলা ভিজে আর বোতল নিয়ে সকলে বসেছে। মোটা মোটা কাচের গ্লাসে ঢালছে, খাচ্ছে। অনর্গল বকুনি, চীৎকার, গোঙানি, কান্না, প্রাণখুলে গান চলতেই থাকে, বিরাম নেই। স্রোতের মতো লোক আসছে আর বেরুচ্ছে।

এখানে যারা আসে তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। শ্মশানেও বিশেষ সম্মান আছে, কিন্তু এখানে সকলেই সমান। প্রায়ই সব নিম্নশ্রেণীর মজুর। এখানকার মানুষগুলোকে এই সময় দেখে মনে হয় যেন এরা সব মালগাড়ীর ইঞ্জিন, স্টেশনে এসে কয়লা জল ভর্ত্তি করে' নিচ্ছে, বোঝা নিয়ে আবার যাত্রা করবে। আর ঐ যে চীৎকার, কান্না আর গান, ওগুলো বাসি বাষ্প, ধূমায়মান আগুন আর ছাই।

দেয়ালের গায়ে মৌলিক সাদা রঙের কোনো চিহ্নও নেই। তার উপর পানের পিচ্, বমি আর থুতুর সংমিশ্রিত প্রলেপ। পেলিতি বা ফার্পো বা এস্পায়ারে সভ্য মানুষ আসে, এখানে আসে জানোয়ার। কারো মধ্যে যদি এ-যুগের সভ্য মানুষ কোথাও লুকিয়ে থাকে, দোকানের ভিতর পা' দিলেই শ্বাসরোধে তার মৃত্যু অনিবার্য্য। সভ্যতার কোনো বালাই নেই এখানে।

বেঞ্চিতে একটি কোণে দেয়াল ঘেঁষে বসে', চল্লিশ পি. সি-র এক নম্বর একটা পাঁইট শেষ করে'. ঢুল্‌ছি। আর একটা পাইট আনবার অর্ডার দিয়েছি, তখনো এসে পৌঁছয়নি। আমাকে ঘিরে জন ছ'য়েক বসেছিল, একজন পাঞ্জাবী ড্রাইভার, একজন নেপালী দারোয়ান, আর চারজন বোধ হয় মুসলমান মিস্ত্রী। এদের সকলের সশ্রদ্ধ বন্ধুত্বে আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম। নিজেদের বোতল থেকে আমাকে মদ ঢেলে দেওয়া, খাওয়ান, 'পি-জিয়ে বাবু'—যেন আমি তাদের অতিথি।

হলের বীভৎস হল্লা তখন কানে শোনাচ্ছে হাজারখানেক ভ্রমরের গুন্ গুন্ গুঞ্জনের মতো। দোকানটাকে মনে হোচ্ছে চলন্ত জাহাজ, টর্পেডোর ঘা লেগে ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের তলায়। চোখ বুজে বসে' বসে' ডুবছি।

এমন সময় ঘরে একজনের হঠাৎ আবির্ভাব হলো। "আরে মুনিয়া পিয়ারী, মুনিয়া, লখিয়া—"। আগন্তুকের সসঙ্গীত নাটকীয় প্রবেশে আমরা সকলে অবাক্ হয়ে তার দিকে ফিরে চাইলাম। আমি সর্ব্বপ্রথম উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম, 'আইয়ে বৈঠিয়ে।' জবাব না দিয়েই বুড়ো একটা পিপের উপর চড়ে বসল। বগলে একটা বোতল, হাতে গ্লাস আর পিঁয়াজির একটা ঠোঙা। বল্লাম, 'আরে আইয়ে, তুম্ তো ভগবান হ্যায়'। সকলে সমস্বরে বলল, 'কিয়া ভগবান! বুড্ডা তো হামরা বাপ্ হ্যায়'। আরে বাপ্‌রে বাপ্ বলে' বুড়ো

পিপে থেকে মেঝেতে উপুড় হয়ে মাথা ঠুকলে কয়েকবার, হাত তুলে নমস্কার করলে। বুঝলাম না কেন। তারপর সে কি ডুক্‌রে ডুক্‌রে কান্না! এই বৃদ্ধই বুধন। কান্নার সঙ্গে কাহিনী। দশ মাস গর্ভবতী মুনিয়া একদিন ভীষণ প্রহার খেয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করে' একটি কন্যা প্রসব করে' মারা গেল। তারপরেই সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আনতে হলো মুনিয়ার ছোট বোন লখিয়াকে বউ সাজিয়ে। তিন দিন মার খেয়ে এগারো বছরের লখিয়া ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল, আর ফিরল না। ছ'মাস থেকে দরিয়াকে বুধন কোলেপিঠে করে', এর ওর স্তন্যপান করিয়ে মানুষ করেছে। আর দরিয়া আজ প্রতিশোধ নিচ্ছে বুড়ো বাপের উপর। দরিয়ার জন্যে তার শান্তি নেই।

কাহিনী আর কান্না শুনতে শুনতে সকলে ঝিমুচ্ছে। আমি তখনো বেশ ডুবে যাচ্ছি। ঘণ্টা বাজল।

ভিড় ঠেলে বুধনের সঙ্গে বাইরে এলাম। বল্লাম, 'তোমাকে চিনি, বুধন'। বস্তির সামনে মাঠকোঠায় থাকি বলতে সাদা [illegible]-জোড়ার তলা থেকে লাল চোখ দুটো তুলে বুধন একবার আমার দিকে তাকাল। কি ভাবলে কে জানে! তারপর ভিড়ের মধ্যে তাকে আর দেখতে পেলাম না।

হোটেলের অর্কেষ্ট্রার স্বর কানে ভেসে আসছে। ক্যাবারের রাত। আমার কানে তখন হাজার হাজার বুধনের কান্নার অর্কেষ্ট্রা বাজছে।

বুধন তারপর একদিন মাত্র এসেছিল ভোরে আমার মাঠকোঠায়। সেই অভিযোগ, দুঃখ আর নালিশ। দরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, মুনিয়ার দুঃখ, আর তার জীবনের। নগরকর্ত্তারা তাদের কোনো আবেদনে কর্ণপাত করেন

না। করদাতারাও ভুলেও কোনদিন ভাবেন না, সহরের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য যেটুকু আছে সেটুকু, ঠিক ঐ দুটি জিনিষই ক্ষয় করে' বাঁচিয়ে রেখেছে কারা। 'আমরা কি মানুষ না, বাবু?' বুধন বললে।

মানুষ? তার বিচারক আমি নই, তাই ভাবিনি কোনদিন। শুধু মনে হয় আজ এতগুলো মানুষকে পশু করে' কি প্রয়োজন কয়েকটা 'সভ্য মানুষ' তৈরী করার? আর কিই বা প্রয়োজন নগর গড়ার, যদি তার ভিতরে থাকে হিংস্র মানুষ-জানোয়ারে-ভরা মহারণ্য?

হাজার হাজার বছর পরে মানুষ প্রশ্ন করছে মানুষকে, 'আমরা কি মানুষ?' হাজার বজ্রের বিদ্রূপের অট্টহাসিতে এর উত্তর মিলবে না কি?

একদিন ভোরে উঠে দেখি বস্তির চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী।

কয়েকদিনে স্তূপে স্তূপে আবর্জ্জনা জমল সহরের রাস্তায়, অলিগলিতে।

ময়লা জমাট বেঁধে গেল। দাবী বিবেচনা করবার সময় নেই। স্পর্দ্ধার সীমা আছে। শাসন প্রয়োজন, কঠোর বিচার হবে ঔদ্ধত্যের।

মাঠকোঠার উত্তরদিকের বারান্দায় ঝুঁকে বিচার দেখলাম। এমন কি কঠোর!

পাশে আমার সেই সঙ্গী এজেণ্টটিও ছিলেন। নির্ব্বিকারভাবে আমার দিকে ফিরে তিনি বল্লেন, 'বেশ আছি মশাই, সঙ সেজে থাই, ভয় নেই'। বল্লাম 'হুঁ'।

সঙ্ঘ-সঙ্গীত শুনলাম। অভুক্ত শিশুদের অসহায় ক্রন্দন, মেয়েদের করুণ কাতরানি, আর অর্দ্ধমৃত পুরুষ-পশুদের গোঙানি—সব মিলে নগর-নরকের এক অশ্রুতপূর্ব্ব 'গ্র্যাণ্ড অর্কেষ্ট্রা'।

কাজ যারা করবে না তাদের ঘর ছাড়তে হবে। ঘর তারা ছাড়ল। অনিরুদ্ধ জনস্রোতে বুধন, দরিয়া, কে কোথায় ভেসে গেল জানি না।

শেষ আঁচড়। রঙও নিঃশেষ।

তিন চার দিন পরে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'লে রাস্তায় বেরুলাম। ঘণ্টাখানেক মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় প্রায় এক হাঁটু পর্য্যন্ত জল। ড্রেণ বন্ধ, মুখ খোলা হয়নি। জল ছিটিয়ে মোটর চলেছে। ফুটপাথ ধরে' আমি চলেছি। স্যাঁতসেতে মন।

বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম দূরে রাস্তার কোণে স্তূপীকৃত পচা আবর্জ্জনার পাশে কালো মত কি একটা কুঁকড়ে রয়েছে। এগিয়ে আসতে রাস্তার আলোয় মনে হলো মানুষ। আবার মানুষ? মানুষের কদর্য্য দুর্গন্ধ!

আলোতে মানুষই দেখলাম। পথিকরা তাকাতে তাকাতে নাকে রুমাল গুজে চলে' যাচ্ছে। চলার গতিটা একটু সংযত হচ্ছে শুধু।

আমার চারিদিকে জীবন্ত মানুষের পচা দুর্গন্ধ।

আবর্জ্জনার মধ্যে একটা মরা কুকুরের আড়ষ্ট ঘাড় বেরিয়ে আছে। তার পাশে দলাপাকানো জীবটি হাটু কুঁকড়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে পড়ে আছে। গায়ে সুরকি ও কাদার ছিটে এসে লেগেছে চলন্ত মোটরের চাকা থেকে। কালো পাথরখণ্ডের মতো অসাড়।

বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম সাদা ভ্রূ—লাল নয়, ফ্যাকাসে চোখ—বৃদ্ধ বুধন হাঁ করে' রয়েছে।

১৯৪১

মহম্মদ ইয়াকুব

কয়েকটি বাড়স্ত জীবন বাত্যাহত ছিন্ন পত্রের মতো অকস্মাৎ এখানে এসে মিলিত হয়েছে। সহরটা সকলের কাছেই বিভুঁই, সকলকেই আসতে হয়েছে জীবনের নাগরিক তাগিদে। সেকথা বোধ হয় আর কারও মনে নেই। শিক্ষা, অর্থ, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা এমনি আরও অনেক সেরা সেরা জীবনের লক্ষ্য পদে পদে ব্যর্থতার স্তূপের তলায় সমাধিস্থ হয়েছে। আজ কেউ সহরটাকে ভাবছে ঘোড়দৌড়ের মাঠ, বরাত ঠুকে টিপ্ ধরে বসে' থাক, তিনে-চারে বারোটা ঘুরে একদিন মিললেই, 'ট্রিপ্‌ল টোট্', জীবনে আর নড়ে' বসতে হবে না। কেউ ভাবছে, সহরের মতো এমন একটা পিচ্ছিল পদার্থ আর নেই—সব কিছুই

এখানে তেলা—টাকা পয়সাও। লাখ লাখ টাকা পিছ্‌লে যাচ্ছে হাতের তলা দিয়ে, একবার যদি ঘা দেওয়া যায় তাহোলে মুঠোর মধ্যে যা আসবে তাতেই জীবন শেষ। দালালি ছাড়া আর কিই বা আছে দুনিয়ায়। বিদ্যার্থী আজ প্রেমের কবি, দীর্ঘশ্বাসের কবি আর প্রাইভেট টিউটর। প্রতিভার বিকাশ যদি বিদ্যায়তনের দেয়ালের মধ্যে না-ই হয়ে থাকে, ক্ষতি কি ? সুধীসমাজে একদিন তার খ্যাতির গুঞ্জরণ এই সহর থেকেই সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিভার উন্মেষ যদি চাও, দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় ক'রে নীরবে সহরে বসে' সাধনা করো। কেউ ভাবছে সহর বৃন্দাবন, জীবন লীলাখেলা, জীবনের দু'চারটে যুযুৎসুর প্যাঁচ যা জানো সহরে দেখিয়ে যাও। টাকা চাও ? জীবন্ত নারীদেহ একহাটে কিনে মাথায় ক'রে আর এক হাটে শূন্য ক'রে দাও, কাঁচা চামড়ার ডমরু বাজাও, বাঁদরও নাচবে, টাকাও মিলবে। কেউ ভাবছে যন্ত্রবৎ জীবন চালু রাখতে হ'লে এই সহর ভিন্ন আর উপায় নেই—। অফিস-ঘর, ঘর আর অফিসের ঘর্ঘরাণি যদি কানে কর্কশ শোনায়, সিনেমায় যাও, থিয়েটারে যাও, স্নায়ুগুলো আল্‌গা হবে, চাকা আবার চলবে।

রবিবারের সকাল। কালকের রেসে পাঁচ টাকায় প্লেসে পঞ্চাশ টাকা পেমেণ্ট পেয়ে বেণীমাধব রাত তিনটেয় ঘরে ফিরেছে। আজ বেলা আটটা বাজল, এখনও তার ঘুম ভাঙেনি। ভাঙা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে গায়ের উপর রোদ এসে পড়েছে, সাড়া নেই। পাশের সিটে পরিমল অকাতরে ঘুমুচ্ছে, মাথার কাছে কয়েকটা মোমবাতি, মেঝের উপর একরাশ টুক্‌রো পোড়া বিড়ি, টি-পয়ের উপর রঙের প্লেট ও তুলি এবং খাটিয়ার পাশে অর্দ্ধ-সমাপ্ত একটা পোর্ট্রেট্, দেখলেই বোঝা যায় রাত জেগে ছবি আঁকতে আঁকতে ঘুমিয়ে পড়েছে। তিন

চারটে আরশলা চেপ্‌টে মরে' রয়েছে বালিশের পাশে। কোণে আর একটি সীটে থাকে কবি ক্ষিতীশ, ভোরে উঠে ছাত্র পড়াতে গিয়েছে, সপ্তাহের একদিন কামাই রবিবারে হাজ্‌রে দিয়ে পূরণ করতে হবে। বারান্দার তিনটি সীটে থাকে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কেরাণী সুধাকান্ত, নূরজাহান হোটেলের এজেন্ট রামপদ, আর শেয়ার মার্কেটের দালাল শশীকান্ত। এরা সকলেই ঘুম থেকে উঠে চা পান করতে করতে বাক্যালাপে ব্যস্ত। খাবার মেনু ঠিক ক'রে সুধাকান্ত বাজারে যাবার উদ্যোগ করছে।

আজ feast হোক, ম্যানেজার: রামপদ বললে। ভারিক্কি চালে যুদ্ধের সম্বন্ধে একটি মন্তব্য ক'রে শশীকান্ত বললে: 'টাটার শেয়ার একশ'টাকায় দশহাজার টাকা দর উঠেছে মশাই, আছেন কোথায়? একখানা শেয়ার থাকলে আজ মেয়েমানুষের পেছনে ঘুরে বেড়াতে হোত না, বুঝলেন?' কথাটা রামপদর গায়ে বিঁধল! রামপদ বললে: 'যুদ্ধের বাজারে সবই তো চড়া, আমার বাজারই মন্দা মশাই—কারবারে যেন্না ধরে' গেছে—আর এখন কিই বা করি—ভাবছি নেভিতে নাম লিখিয়ে এইবার সমুদ্রে পাড়ি দেব—'

—কেন হোলো কি আপনার?

সুধাকান্তর প্রস্থানের জন্য অপেক্ষা করছিল রামপদ। তার উপার্জ্জনের এই পন্থার সঙ্গে পরিচিত শুধু শশীকান্ত, বাকি সকলে জানে হাওড়ার হাটে সে কাপড়ের ব্যবসা করে, কাপড়ের গুদাম আছে চিৎপুরে। সুধাকান্ত রওনা হো'লে রামপদ গলার স্বর নামিয়ে বললে:

—হবে কি মশাই! অনেক কষ্টে একটির খোঁজ পেলাম—বিশ বাইশ বয়েস—গিধধোড় ব্যাটা মাড়ুয়া বলে কি জানেন? দশ টাকা—হাফ নয় মশাই, পুরো গেরস্ত—

পুরণো লোহা-লক্কড় খুঁজে বেড়ান রামবাবু—ওজন দরে বেচলেও কিছু পাবেন।

—ওসব জ্যান্তমালের ব্যবসা যুদ্ধের সময় চলে না—লোহা-লক্কড়-তামা-পিতল-এ্যালুমিনিয়াম-এর কাছে মেয়েমানুষ?

দরজার কাছে কার পায়ের শব্দ শুনে শশীকান্ত থামল। আগন্তুক ভদ্রলোক চৌকাঠে পা দিয়ে নমস্কার জানিয়ে বললে:

'শশীকান্তবাবু কার নাম?' 'আমার, কেন বলুন তো?' ভদ্রলোক একখানা চিঠি তার হাতে দিয়ে বললে: সুধীরবাবু দিয়েছেন।

চিঠিখানা পড়ে' শশীকান্ত একবার ভদ্রলোকের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিলে। সাদাসিধে পোষাক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; হাড়সার দেহের চওড়া কাঠামোটা আজও অতীত স্বাস্থ্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন ভাঙা বাড়ীটার ভিতরের ইটগুলো পর্য্যন্ত স্পর্শ করছে, অমায়িক কথাবার্ত্তা, চালচলন।

—সীট তো আমাদের একটাও খালি নেই। ঘর একটা আর এই বারান্দা—আমরা ছ'জন থাকি। উপরের সিঁড়ির ঘরটাতে আপনি যদি থাকতে পারেন তাহলে ব্যবস্থা করা যায়। খাওয়া দাওয়ার কিন্তু খুব 'কষ্ট হবে আপনার। শশীকান্ত বল্‌ল।

অমায়িকভাবে হেসে ভদ্রলোক বললেন: না—কষ্ট হবে কেন? আপনারা যখন আছেন, আমার একার আর কষ্ট কি হবে?

—কি করেন আপনি জিজ্ঞেস করতে পারি কি? এবার রামপদ প্রশ্ন করল, এদিকে তার কৌতূহলই বেশী। 'সিগ্রেট ফ্যাক্টরীতে কাজ করি—'

বেণীমাধবের চোখের ঘোর কেটেছে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘরের ভিতর থেকে বলল: বেশ! বেশ! আসুন মশাই—নরক গুলজার করা যাবে—দু'চারটে সিগ্রেট রোজ পাওয়া যাবে তো—?

ভদ্রলোক আবার অমায়িক ভাবে হাসলেন। ঠিক হোলো তিনি সেদিন সন্ধ্যাতেই আসবেন, খাওয়া থাকার জন্যে মাসে আট টাকা দিতে হবে।

মধ্যাহ্ন ভোজের সময়। রামপদ বিরক্তির সুরে বলল:

—অজ্ঞাত কুলশীলকে কেন মশাই ঢোকান এর মধ্যে?

শশীকান্ত বলল: নিরীহ ভদ্রলোক—মনে হয় না মতলববাজ, সিঁড়ির ঘরে থাকবেন, দু'বেলা খাবেন, তাতে আমাদের আর কি অসুবিধে হবে?—তা ছাড়া সুধীরের পরিচিত—

আরে ও দু'দিনেই আমি ভজিয়ে নেব দেখো—থাক না—ভদ্রলোক তো আর ক্ষতি করছে না কিছু—আর আমাদেরই মতো একজন হতভাগা যখন—বেণীমাধব ঢেঁকুর তুলে বলল।

বাকী তিনজন এক রকম উদাসীন।

সহরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা বড় রাস্তার পাশেই বাড়ীটা। পঞ্চাশ বছর আগেও নবাব হাজি কাসিমের পুত্র মীরকাসিম এখানে বাইজী নাচিয়েছেন, শরাব পান করেছেন। তখন এই অঞ্চলের নাম ছিল হাজি কাসিমবাজার। বাইরে থেকে বাড়ীটাকে ভগ্নস্তূপের মতো মনে হয়। বিরাট ভাঙা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে চওড়া চওড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই দু'পাশে দুই বহির্মুখী গোলাকৃতি ঘর, মধ্যে মোটা মোটা থামের সারি, দুইদিকে

দুটি বড় বড় হলঘর—পিছনে অর্দ্ধ-বৃত্তাকার বড় বারান্দা—তারপর সিঁড়ি ও বাগান।

বারান্দা ও একটি হলঘরকে দু'ভাগ ক'রে শশীকান্তর প্রাইভেট মেস। বাইরের গোলাকৃতি দু'টি ঘরে জনকয়েক রিক্সাওয়ালা রাত্রিযাপন করে। বাগানে বুনো ঘাস গজিয়েছে, তারই উপর চারিদিকে ভাঙা মাড্গার্ড ও ছেঁড়া নারকেল-ছোবড়ার গদি ছড়ানো। আগে ছিল মোটরের কারখানা, কেউ বলে তারও আগে নাকি এটা টাকা ও নোট জালের গুপ্ত ঘাঁটি ছিল।

আজ মাসখানেক হোলো সেই ভদ্রলোক এসেছেন। মেসের সকলে তাঁকে 'ভোলাদা' বলে। এমন আত্মভোলা লোক নাকি তারা জীবনে দেখেনি।

ভোলাদা ভোরে উঠে বেরিয়ে যায়, দুপুরে কোনদিন ফেরে, কোনদিন ফেরে না। সন্ধ্যার পর ফিরে আসে মেসে। সিঁড়ির ঘরটাতে গিয়ে ছোট একটি লণ্ঠন জ্বেলে পড়াশুনা করে। একটু রাত হোলে এক এক ক'রে আট দশ জন লোক আসে ভোলাদার কাছে। কেউ ভদ্রলোক নয়। কালো কালো চোয়াড়ে চেহারা, লুঙ্গি পরা। বিড়িওয়ালা হবে, কিংবা গাড়োয়ান।

একটা ভাঙা মাড্-গার্ডের উপর বসে' সামনের বাগানটায় ভোলাদা রাত প্রায় দুপুর পর্য্যন্ত ঐ লোকগুলোর সঙ্গে বিড় বিড় ক'রে আলাপ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলেঃ 'ফ্যাক্টরীতে কাজ করে, আমারই আণ্ডারে। জেনারেল রিট্রেঞ্চমেণ্টে চাকরী গেছে, তাই আসে আমাকে দিয়ে সাহেবকে বলাবার জন্যে।' ভোলাদার কথা অবিশ্বাস করা যায় না।

বেণীমাধবের ঘোলাটে দৃষ্টি কিন্তু সর্ব্বদাই মাড্-গার্ডের উপর বসা লোকটির উপর নিবদ্ধ থাকে। চোখের সামনে বিড়ির আগুনের ফুল্‌কি ওড়ে, আকাশ থেকে তারা খসে' যায়। গেঁজেল, মাতাল আর জুয়াড়ী চরিয়ে তার জীবন

গেল, একজনের চোখ দেখে তার চোদ্দপুরুষের খবর বলে দিতে পারে; অথচ এই লোকটা এতো সরল হয়েও এত জটিল মনে হয় কেন? বেণীমাধব ঘুমিয়ে পড়ে।

শশীকান্ত বারান্দায় পায়চারী করতে করতে আড়চোখে চেয়ে দেখে। 'লোকটা এ্যানার্কিষ্ট নাকি?' মনে মনে ভাবে। কিন্তু এত অন্তরঙ্গভাবে কি সকলের সঙ্গে মেশা যায়?

সত্যই তো! রামপদ কোনদিন গভীররাতে ফিরে ভোলাদাকে বিছানা থেকে তুলে তার হোটেলের কেলেঙ্কারির কাহিনী বলে: ভোলাদা! কলকাতার সহরটা মেয়ে মানুষের জোরেই চলছে। পনেরোদিন যদি সব মেয়েদের বাইরে চালান ক'রে দেওয়া যায়, সহরের আর অস্তিত্ব থাকবে না। ব্যবসা চলছে নারীদেহের ভোলাদা—ওপরের কলকব্জা তো বাইরের ঠাট। আছে নাকি সন্ধানে কেউ—?

ভোলাদা হাসিমুখে এরও জবাব দেয়। বলে: আমার সঙ্গে ভাই কারও আলাপ নেই। আমাকে দেখলে মেয়েরা পালিয়ে যায়—আমি নাকি কাঠখোট্টা লোক।

পরিমল ছবির আলাপ করে, ভোলাদা উত্তর দেয়। ক্ষিতীশ কবিতা পড়িয়ে শোনায়, ভোলাদা চোখ বুঁজে শোনে। বেণীমাধবকে মাঝে মাঝে পাঁচ আনা পয়সা দিতে হয় রেসের জন্যে, এক-আধ প্যাকেট সিগ্রেটও কিনে আনতে হয়—ফ্যাক্টরীর লোক কিনা?

কাসতে কাসতে ভোলাদা বিছানার উপর উঠে বসল। নিশুতি রাত। আজ আর ভোলাদার ঘুম হয় নি। অসহ্য যন্ত্রণা বুকের মধ্যে। ফুস্‌ফুস্ দু'টো

দিন দিন ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। মেসের সামান্য ক'টা টাকা অতি কষ্টে যোগাড় হয়—চিকিৎসা করবে কে? দু'হাতে বুকটা চেপে ধরে' ছাদের উপর এসে পায়চারি করে ভোলাদা। বাইরের ঘরে রিক্‌সাওয়ালারা ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। রাস্তা জনমানবহীন। কেঁউ কেঁউ ক'রে কয়েকটা নেড়ী কুকুরের ছানা ডাকছে বাড়ীটার কোনো গর্ত্তের মধ্যে।

নীচে খুব জোরে হঠাৎ 'ওয়াক্' 'ওয়াক্' শব্দ শোনা গেল। সিঁড়ির উপর এসে দাঁড়াল ভোলাদা। শব্দটা আর কিছু নয়, বমির। বেণীমাধব নেশায় চুর হয়ে ঘরে ফিরে বমি করছে, আর কাতরাচ্ছে। জ্বরের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে সুধাকান্ত বাইরের বারান্দায়।

ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ভোলাদা নেমে এল নীচে। ডানহাত দিয়ে বেণীমাধবকে বেষ্টন ক'রে বললে: আসুন বাইরে। চমকে উঠল বেণীমাধব—গরম একখানা হাত লোহার মতো কঠিন। অন্ধকারে যেন বেণীমাধবকে চূর্ণ ক'রে ফেলবে।

দু'বালতি জল মাথায় ঢেলে দিয়ে ভোলাদা বেণীমাধবকে শুইয়ে দিলে বিছানায়। জোরে জোরে মাথায় হাওয়া দিয়ে বললে: ঘুমোন বেণীবাবু।

—আপনি আমার আর জন্মের মায়ের পেটের ভাই ছিলেন ভোলাদা—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেণীমাধব বললে।

—এজন্মেও আছি ভাই—এখন একটু ঘুমোন।

চোখ দু'টো জড়িয়ে আসে। কোহল-ক্লান্ত চোখ দু'টো তুলে বেণীমাধব একবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখে। অন্ধকার ঘরে ভোলাদা বসে আছে শিয়রের কাছে, লোহার মতো কড়া-পড়া দু'খানা হাত মাথার উপর চেপে বসানো। ঘুম আসে।

অন্ধকার বাইরের বারান্দায় বেডের উপর জ্বরে অচৈতন্য সুধাকান্ত চমকে ওঠে: কে! কে!

ভারী গলায় কানের কাছে শোনা যায়: আমি, ভোলাদা! কষ্ট হচ্ছে খুব?

মাথার চুলের মধ্যে একখানা হাত, আর একখানা হাত বুকের উপর। সুধাকান্তর চোখে জল এল। এ আবার কি? বহুদিনের অনাস্বাদিত জীবনের এ আস্বাদ আবার কেন? অন্তরের এই গাঢ় স্পর্শ, এই গভীর অনুভূতির প্রয়োজন কি? কে ভোলাদা? বাড়ীটার ভাঙা ইঁটের পাঁজরে পাঁজরে খোদা আছে জীবনের কলঙ্ক। পীড়িত, দলিত সেই জীবনের কান্নার ধ্বনি আজও শোনা যায় এই জীর্ণ বাড়ীটার কঙ্কালের ভিতর থেকে। আমাদের জীবনও তো বাড়ীটার এই পুরাণো ভাঙা ইঁটের মতো। তাই তো যন্ত্রের মতো শ্বাস প্রশ্বাস টান্‌তে টান্‌তে শ্বাসযন্ত্রের প্রক্রিয়া একদিন বন্ধ হয়ে যাবে জানি।

চিন্তাধারায় সুধাকান্ত'র ক্লান্তি আসে। ঘুম আসে শুশ্রূষার প্রশান্তিতে।

বারান্দায় সংলগ্ন বন্য তৃণোদ্যানে ভোলাদা দু'হাতে বুকটা চেপে ধরে পায়চারি করতে থাকে। আকাশে চাঁদ নেই। কৃষ্ণপক্ষের রাত। বুকের ভেতর কে যেন সূঁচ দিয়ে সেলাই করছে। রাস্তায় হোস্-পাইপের শব্দ হবে কখন?

একদিন নয়, একরাত নয়, এরকম অনেক রাত, অনেক দিন যায়। বিস্বাদ কয়েকটা জীবনের সঙ্গে ভোলাদার এই নিবিড় যোগাযোগের মধ্যে সকলেই বুঝতে পারে কোথায় যেন একটা বিশাল ব্যবধান রয়েছে। পরিমলের ইঁদুর-কাটা পটের উপর 'অভিসারিকার' অর্দ্ধ-সমাপ্ত মুখের পাশে ভোলাদার মুখ

ভেসে ওঠে। প্রাইভেট টিউটর যখন কবির কল্পনায় রহস্যের যবনিকা তুলে ধরে তখন ভোলাদাকে মনে হয় পলাতক খুনী। শশীকান্তর দালালী বুদ্ধি ও যুক্তিতে ভোলাদা এ্যানার্কিস্ট,—সকলকে না হাজতে যেতে হয় শেষ পর্য্যন্ত। রামপদ ভাবে, ভোলাদা ব্যর্থ প্রেমিক। সুধাকান্তর মনে হয়, ভোলাদা নিরীহ লোক, উদার মন, শ্রদ্ধেয়। বেণীমাধবের কোহল-ক্লান্ত চোখের সামনে বার বার ভোলাদার সেই মূর্ত্তি ভেসে ওঠে, চারিদিকে তার সেই কালো কালো চোয়াড়ে মুখ আর বিড়ির আগুনের ফুল্‌কি।

ভোলাদার বুকের যন্ত্রণা বেড়ে যায়। সকলে জানে ভোলাদার অসুখ হয় না, অসুখ হোলেও কাতর হয় না। ভোলাদার হাড় দিয়ে রাইফেলের বুলেট তৈরী করা যায়।

আজ রাতে ভোলাদার কাতর আর্ত্তনাদ ক্ষীণ হোলেও সকলে শুনেছে। বুলেট বিঁধেছে ভোলাদার হাড়ে, পাঁজরে, ফুস্‌ফুসে। রাইফেলের নয়, টিউবার্কল্‌ ব্যাসিলির। সেই চোয়াড় কালো কালো একদল লোক ভোলাদাকে ধরে ঘিরে বসে' আছে। সকলে দাঁড়িয়ে আছে পাশে। গ্যালপ্‌ করে' ছুটেছে যক্ষ্মা। কাটা পাঁঠার ছিন্নমুণ্ড ধড়ের মতো ভোলাদা ছিট্‌কে পড়ল সিঁড়ির উপর। একজোড়া মত্ত বল্‌গাহীন অশ্বের শক্তি ভোলাদার, টেনে রাখা যায় না। অনর্গল রক্তবমিতে চোখ দু'টো নিস্তেজ হয়ে আসছে।

দিনের আলো দেখা গেল দূরে। হোস্‌-পাইপের শব্দ হোলো রাস্তায়। ভোলাদাকে বারান্দায় নামানো হয়েছে।

কালো কালো চোয়াড়ে মুখগুলোর উপর যেন কালি জমাট বেঁধে গিয়েছে। রুক্ষদৃষ্টি রুক্ষতর হয়ে ভোলাদার বিবর্ণ মুখের উপর নিবদ্ধ। রুক্ষতা ভেদ

ক'রে বড় বড় জলের ফোঁটা পড়ছে কালো চামড়া বেয়ে। কালো জল নয়, কালো কালো নির্ব্বাক মুখ। বেণীমাধবের বিড়ির আগুনের ফুলকি গিয়েছে আজ মুখ থেকে এদের চোখে। কাল সারারাত মদ্যপানের পর বেণীমাধব অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

ভোর্ হোলো। বারান্দার ওপরে 'খট্ খট্' জুতোর শব্দ শোনা গেল। আগন্তুক ভদ্রলোক ভোলাদা নয়, পুলিশ ইন্সপেক্টর, পিছনে জমাদার, হাতে বিড়িওয়ার্কাস ইউনিয়নের সেক্রেটারী মহম্মদ ইয়াকুবকে গ্রেপ্তার করার পরোয়ানা। মীরকাসিমের জীর্ণ প্রমোদ-ভবন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে লাঠিয়াল পুলিশ। রাস্তায় কৌতূহলী জনতা নয়, প্রায় তিন শ' কালো কালো চোয়াড়ে লোক, রুদ্ধদৃষ্টি, আর তারই মধ্যে ঊর্দ্ধে উড্ডীন একটি পতাকা, লাল রং-এর।

ভাঙা বাড়ীর গর্ত্তগুলি তল্লাস ক'রে ভোলাদার শেষ সম্বল যা কিছু ছিল পাঁজা ক'রে নিয়ে চলল পুলিশ। ইন্সপেক্টর বললেন, শবযাত্রা থানা ঘুরে যাবে গোরস্থানে।

ইয়াকুবের মৃতদেহ ঘিরে পুলিশ-বেষ্টিত শবযাত্রীরা চলল থানা হয়ে গোরস্থানের দিকে। সুধাকান্ত একবার সকলের হতবাক মুখের দিকে চেয়ে বললে: মহম্মদ ইয়াকুব! সকলের চোখে তখন জল টলমল করছে।

ভাঙা বাড়ীটাকে আজ সত্যিই মনে হোলো জীর্ণ, পরিত্যক্ত একটা খোলস্। জীবন গিয়েছে গোরস্থানের দিকে। নতশির শবযাত্রীরা কারা? কালো কালো চোয়াড়ে মুখের উপর বেদনার মূর্ত্তি যেন আজ খুদে দিয়েছে কে। কালো মুখ আরও কালো হয়েছে।

বেণীমাধবের নেশার ঘোর তখনও কাটেনি। সব কিছু যেন দুর্ব্বোধ্য দুঃস্বপ্ন, দৈত্য এল আর গেল। ভোলাদার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ ক'রে অর্দ্ধ-মাতাল বেণীমাধবের জড়িত কণ্ঠস্বর তখনও নিঝুম বাড়ীটার জীর্ণ-পঞ্জরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছেঃ "ছোড়্ দেও—হামারা ভাই হ্যায়—ছোড়্ দেও—"

১৯৪২

ভদ্রার বাঁধ

এই সেই ক্ষেত !

সব শ্যামলিমা আজ তার ম্লান হয়ে গিয়েছে। ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে হাজার হাজার ধানের শীষ আজ আর দূর থেকে অভিনন্দন জানায় না। ভদ্রার আর সেই কলোচ্ছ্বাস নেই, নেই প্রবাহের পথে তার সেই ছোট ছোট তরঙ্গের নূপুরধ্বনি। ভুঁই নিড়োতে নিড়োতে ক্লান্ত হয়ে কতদিন সে আলের উপর বসে চেয়ে দেখেছে এই ভদ্রাকে—মনে মনে বলেছে, 'ভদ্রা ! ক্ষেতগুলোকে আর বানের জলে ভাসিয়ে দিস্‌নে, দিস্‌নে।' কোথাকার সর্ব্বনেশে লোণাজল এসে জমিটার জান্‌ নিয়ে চলে যায়—দু'তিন বছর ধানের মুখ আর

দেখা যায় না। ভদ্রা বয়ে চলে যায় আপন মনে। সেই সর্ব্বনাশই ডেকে আনে। ফলে না জমি। বোবা মাটি লাঙ্গলের ফলার দিকে চেয়ে থাকে—ক্ষেত-মজুরের দল মাথা খুঁড়ে মরলেও মুখে তার কথা ফোটে না। দুর্ভিক্ষ আসে। গাছের পাতা শুকিয়ে ঝ'রে পড়ে মাটির উপর। শুক্‌নো কড়কড়ে পাতা রোদে-পোড়া বুকফাটা মাটির উপর সশব্দে ঝরে' পড়ে—যেন মৃতমাটির কঙ্কাল দাঁত কিড়মিড় করছে।

আগাছায় ভরা আলের উপর দাঁড়িয়ে শক্ত হাড়ের মুঠোয় শান্‌-দেওয়া কাস্তের হাতল ধরে এক সঙ্গে তে-হাজারি গ্রামের তিন শ' কিষাণ ভদ্রাকে শাসিয়ে দেয়: 'বাঁধব তোকে—বাঁধবই ত।' শুক্‌নো মাটির বুকটা শিউরে উঠে।

জমিদার রঘুনন্দন চৌধুরী তাঁর কাছারির হলঘরে ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে' আলবোলায় তামাক খাচ্ছেন। হলঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বহু পুরাতন ভৃত্য রামলক্ষ্মণ, বাইরে সিঁড়ির কাছে বিরাটকায় দোবেজী লাঠি কাঁধে তা দিচ্ছে গোঁফে। নায়েব সিদ্ধেশ্বর বাবু তেহাজারির অবস্থা বর্ণনা করছেন, খাজাঞ্চিবাবু দাঁড়িয়ে আছেন পাশে। দু'বছর কোন ফলন নেই—খাবার নেই চাষীদের ঘরে—খাজনা তমাদি হবার উপক্রম।

'তামাদি ঠেকাতেই হবে নায়েব—একসনের খাজনা আমার চাই-ই। ঘোড়ার ঘাস কাটতে কি এতগুলো আমলা পুষছি?' 'আজ্ঞে না হুজুর! চোখে দেখেছি—' 'চুপ, চুপ করো সিদ্ধেশ্বর!' নলটি তিনবার তাকিয়ার উপর জোরে জোরে ঠুকে রঘুনন্দনবাবু বললেন: 'সিপাই পাঠিয়ে বেঁধে নিয়ে এস সব কাছারিতে—আটকে রাখ আস্তাবলে—তারপর মেয়েছেলেরা এসে যখন কাঁদাকাটি করবে তখন বোলে দিও খাজনা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে—'

হঠাৎ দূর থেকে মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল : 'ভদ্রাকে বাঁধতে হবে।' তড়াক করে লাফ দিয়ে হলঘরের দরজার সামনে গিয়ে দোবেজী জানিয়ে দিল, একদল প্রজা, মেয়ে পুরুষ মিলে আসছে কাছারির দিকে। নায়েববাবু চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন : 'রোখো, রোখো'। হাতের তেলোর খইনিটা জিবের তলায় গুঁজে দিয়ে লাঠিটা মাথার উপর ঘুরিয়ে দোবেজী ছুটল অগ্রগামী জনতার দিকে।

একপা একপা করে পিছু হটতে হটতে দোবেজী কাছারির সিঁড়িতে এসে ধাক্কা খেল। সিদ্ধেশ্বর বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন : 'কি চাই তোদের ?'

সমস্বরে উত্তর এল 'ভদ্রাকে বাঁধতে হবে।' নায়েববাবু এগিয়ে এসে সিঁড়ির উপর দাঁড়ালেন। জনতার ভিতর থেকে একজন বললে, 'আমরা বাঁধ চাই—না হলে হুকুম চাই হুজুরের—আমরাই বেঁধে নেব'।

হলঘরে এতক্ষণ রঘুনন্দনবাবু গুম্ হয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। কথাটা তাঁর কানে গিয়ে শিকারীর বাণের মতো বিঁধল। বাণবিদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো হুংকার দিয়ে বৃদ্ধ রঘুনন্দন বেরিয়ে এলেন—'কে-ও নায়েব ? কে ? কে বল্ছে বেঁধে নেবে ? বেঁধে নিয়ে আয় এদিকে—দোবে—।'

দোবে প্রস্তুত।

অসহায় জনতার মিনতি মান্‌ল না নথ্‌নি দোবে। হুকুম হুজুরের। হলধরকে বেঁধে নিয়ে চলে গেল ভিতরে। হলধরের বৌ নায়েবের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে পড়ল। স্তব্ধ হয়ে রইল জনতা

নায়েবের কণ্ঠস্বরের কাঁপুনি কমেছে। তিনি বললেন, 'ফিরে যা তোরা—সাত দিনের মধ্যে খাজনা দিয়ে যাবি এক সনের, তারপর তোদের বাঁধের কথা শুনব।'

'হলধরকে ছেড়ে দেন, হুজুর!' আওয়াজ এল।

'মুখের উপর কথার জবাব দেয়—এত বড় স্পর্দ্ধা তার—ছোট মুখে বড়ো কথা—বিচার হবে তারপর ছেড়ে দেব—যা তোরা এখন, হল্লা করিস্ নে।'

নিরুপায় জনতা ফিরে গেল ঘরে।

পথের মধ্যে সুন্দর রুখে দাঁড়িয়ে বল্লে, 'চলে যাব ভিটে ছেড়ে ভিন্ গাঁয়ে।' শ্রীধর বুড়ো এতক্ষণ চুপ করে ছিল—একগাল পাকা দাড়ি একবার চুম্‌রে নিয়ে বলে, 'জান্ থাকতে না—। গাঁয়ের উপর দরদ নেই, গাঁ বাড়বে কোত্থেকে? রজনীর জোয়ান ছেলেটা হালচষা ছেড়ে দিয়ে গেল চট্টলে হাওয়াই জাহাজের ঘাঁটি গড়তে—গাঁয়ের আর দোষ কি?'

তেহাজারি গ্রামটাকে অশ্বখুরের মতো বেড় দিয়ে ভদ্রা পূব দিকে প্রায় এক মাইল এঁকে বেঁকে গিয়ে মিশেছে বেণী নদীর সঙ্গে। গ্রামে কয়েক ঘর অবস্থাপন্ন জেলে বাস করে—জমিদারের তারা মোটা খাজনা যোগায় এবং গ্রামের শান্তিরক্ষার জন্যে জমিদারের সিপাইয়ের কাজ করতেও পিছ্‌পা হয় না। গ্রামের আভ্যন্তরীণ শাসনের ভার একরকম তাদের উপরেই থাকে বলা চলে। ভদ্রার পাড়ে কোঁচ্‌বিদ্ধ বা ভদ্রার জলে ভাসমান দু'একজন চাষীর মৃতদেহ প্রায়ই দেখা যায়। হেঁসোর টানে পেটচেরা দু'একজন জেলে নির্জ্জন মাঠের কোণে গর্ত্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে থাকে।

ভদ্রার বুকে সারি সারি জেলেডিঙ্গির উপর টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলে রাতে। জাল ফেলার শপ্ শপ্ শব্দ হয়। গ্রামের বুকে প্রায় একশ' ঘর নিরুপায় নিঃস্ব চাষী ভদ্রার দিকে চেয়ে আক্রোশে ফুলতে থাকে। মনে হয় ডিঙ্গিগুলো নদীর মধ্যে গোর দিয়ে আষ্টেপিষ্টে, ভদ্রাকে রাতারাতি বেঁধে ফেলে

দেয়। কিন্তু একশ' ঘর ক্ষেত মজুর কিছুতেই পঞ্চাশ ঘর জেলেদের বাগে আনতে পারে না। পঞ্চাশের পিছনে আছে একাই এক লক্ষ রঘুনন্দন চৌধুরী। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এমনি করেই কাটে।

ভদ্রাকে বাঁধার আওয়াজ জেলেদের কানেও পৌঁছে গেল। একজোট হয়ে তারা জমিদারকেই একরকম শাসিয়ে এল, 'ভদ্রায় যদি বাঁধ পড়ে, সমস্ত গ্রাম তারা আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে'—

রাত্রি এক প্রহরের সময় শিমুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হলধর ঢাকে বাড়ি দেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে পঞ্চাশ ষাটজন লোক এসে জমা হয় গাছতলায়। হলধর বলে: 'জমিদার ভয় দেখিয়ে আমাদের বাঁধ তোলা বন্ধ করতে চায়। আরং ফৌজ ঘুরে বেড়ায় গাঁয়ে—ভাড়াটে সিপাইরা ঘরে ঢুকে মেয়েদের উপর জুলুম করে। কাছারি বাড়ী ধরে' নিয়ে গিয়ে তিন চারদিন না খাইয়ে বেঁধে রাখে। আজ সুন্দরের ঘরে আগুন লেগেছে, কাল লাগবে আমার ঘরে। এইবার আমাদের একজোট হতে হবে—ডাক দিলে যেন গাঁয়ের তিনশ' ছেলেমেয়ে পুরুষ আমরা এক জায়গায় এক হয়ে দাঁড়াতে পারি।'

'জমিদার যদি লাঠিয়াল পাঠায়?'

'লাঠি দিয়ে ঠেকাব?'

'ঘর পুড়িয়ে দেয়?'

'গাছতলায় থাকব, গাঁ ছেড়ে কেউ এক পা নড়ব না।'

'বাঁধ?'

হলধরের মুখে আর কথা যোগায় না। সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আসল প্রশ্নের কাছে এসে হলধর আর উত্তর পায় না খুঁজে।

তেহাজারির কথা শুনে জেলা থেকে বিষ্টুঠাকুর গ্রাম দেখতে এলেন। শিমুলতলায় ছোট্ট একটি সভা হ'লো। আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনে ঠাকুর বললেন, 'মহকুমা হাকিমের কাছে তোমাদের নিয়ে যাব। তাঁর কাছে বুঝিয়ে বলবে তোমাদের কথা। তোমরাই বলবে—'

পরদিন ভোরে জন পনেরো লোক নিয়ে বিষ্টুঠাকুর তিন মাইল হেঁটে গিয়ে হাকিমের বাংলোয় উপস্থিত হলেন। প্রাতঃরাশ শেষ করে মহকুমা হাকিম আবদার রহমান চারজনকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। সকলে তাদের বক্তব্য বলে হাকিম সাহেবকে একবার গ্রামটা সফর করার জন্যে অনুরোধ করল। ঠাকুর এদের দাবী আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন।

রহমান সাহেব বললেন, তিনি কয়েকদিনের মধ্যে সফরে যাবেন।

ফিরবার পথে বিষ্টু ঠাকুর বল্লেন, 'তোমরা গ্রামের সব চাষী মিলে একটা সমিতি গড়ো হলধর! তুমিই তার দায়িত্ব নাও। সমিতি থাকলে তোমাদের মেলামেশার সুবিধা হবে, একসঙ্গে তোমরা কাজ করতে পারবে—তোমাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে লড়তে পারবে—'

রহমান সাহেব সফর করে বল্লেন, 'জেলেরা যদি রাজী হয় তোমরা বাঁধ দিতে পার। তবে একবার ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি আমি এনে দেব। কিন্তু কি হবে এখন বাঁধ দিয়ে—গ্রাম তো তোমাদের যে কোনদিন ছাড়তে হোতে পারে।'

'কেন ছাড়তে হবে ?' হলধর প্রশ্ন করল।

'যুদ্ধের জন্যে। তোমাদের এই গ্রামে সৈন্যদের ঘাঁটি হবার কথা হোচ্ছে। জেলেদের নৌকোও আর এ নদীতে রাখা চলবে না।'

'যুদ্ধ কি এখানেও হবে ? জার্ম্মাণীতে হোচ্ছে, বিলেতে হোচ্ছে, জাপানে হোচ্ছে—এখানে কি ?'

হাকিম সাহেব ঘোড়ার লাগাম ধ'রে একটা টান দিয়ে পেটে একটা ঠোক্কর মারেন।

'কবে আমরা জান্‌ব, হুজুর।'

'এক সপ্তাহের মধ্যেই' বলে রহমান সাহেব পথের বাঁকে ঘোড়ার পিঠে অদৃশ্য হয়ে যান।

'ওসব ভয় রে ভয় ! যুদ্ধ যখন হবে তখন, বাঁধ আমরা বাঁধবই' !

এক দুই করে তিন সপ্তাহ চলে গেল। গ্রামের লোকেরা হাকিমের বাংলোর ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে রঘুনন্দন চৌধুরী দুই সিপাইসহ বেরিয়ে আসেন, আড়চোখে তাদের দিকে চেয়ে চলে যান। জমিদার-কাছারির প্রাঙ্গণে গিয়ে তারা জড়ো হয়। কিছুক্ষণ পরে হাকিম সাহেব গট্ গট্ করে বেরিয়ে এসে লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে চলে যান। এ-ওর মুখের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা বুঝে নেয়। ফিরে আসে গ্রামে। রঘুনন্দন চৌধুরী বুঝিয়েছেন হাকিম সাহেবকে যে নদীতে বাঁধ দিলে গ্রামের মধ্যে একটা ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যাবে। তার প্রতিক্রিয়া আশেপাশের গ্রামেও ছড়িয়ে পড়বে। এই শান্তিভঙ্গের দায়িত্ব হাকিম সাহেবের না নেওয়াই উচিত।

ঠাকুরের কথাতে শিমুলতলায় বসে' সকলে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল—'রাতারাতি আমাদের বাঁধ দিতেই হবে। সন্ধ্যায় জেলেরা যখন ঘাট থেকে নৌকা ছেড়ে দেবে তখন কাজ আরম্ভ হবে। রাতের মধ্যে কোনরকমে যদি বাঁধ বাঁধতে পারি, ভোরে হাকিম সাহেবের কাছে বলব—বাঁধ আমরা বেঁধে ফেলেছি। পূবদিকে আমরাই একটা ছোট খাল কেটে জেলেদের নৌকো রাখার ব্যবস্থা করে দেব। জেলেদের বুঝিয়ে বললে সব মিটে যাবে।'

পরদিন সন্ধ্যার পর দলে দলে গ্রামের কৃষকরা হাজির হ'লো নদীর বাঁকের কাছে। হাতে লাঠি ও লণ্ঠন, কোদাল, সাবোল, কুড়ুল, মাথায় ছেঁড়া চাটাই, কাঁথা, মাদুর, ন্যাকড়া, নারকেল দড়ি। পাঁজা পাঁজা বাঁশ এল জমিদারের বাঁশঝাড় থেকে।

ছোট ছোট পোষ্টে লণ্ঠন ঝুলছে চারিদিকে। হেঁই-হেঁই ঝপ ঝপ শব্দে কোদাল চলছে দূরে একশ'খানা মাটির উপর। তৃতীয়ার চাঁদ উঁকি দিচ্ছে মেঘের কোণ থেকে। ক্ষীণস্রোতা ভদ্রার স্বচ্ছ জলে কোমর ডুবিয়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে কপ্‌নি-আঁটা বিশজন জোয়ান এপার থেকে ওপার। বাঁশ বিঁধছে ভদ্রার বুকে। ভদ্রার স্রোত এদিকটাতে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

হাতের মাংসপেশীগুলো অবশ হয়ে আসে। শিরগুলো ফুলে ওঠে নারকেল দড়ির মতো। গরুর খুরের মতো শক্ত হাত ফুঁড়েও দু'এক ফোঁটা রক্ত পড়ে নদীর জলে—হয়ত লাল হয় না। কোদালের বাঁটের উপর মাথা দিয়ে বসে থাকে ওরা—দরদর করে গা' দিয়ে ঘাম পড়ে শক্ত মাটির বুকে।

বাঁধ উঠেছে পেট পর্য্যন্ত। বাঁ দিকের একটা পাড় ধ্বসিয়ে নিয়ে ক্ষীণস্রোতা শীর্ণকায়া ভদ্রা প্রচণ্ড ঔদ্ধত্যে আবার কুল কুল করে চলে যায়। দ্বিপ্রহরের ডাক ডেকে শৃগালের দল থেমে যায় দূরে।

এতগুলো জোয়ান হয়রাণ হয়ে পড়ে' থাকে মাঠের উপর, মাটির উপর। জেগে থাকে হলধর, ওসমান, সুন্দর, লতিফ, আবদুল আর বিষ্টু ঠাকুর।

ঠাকুরের কথায় ছুটে যায় সব গ্রামের মধ্যে। মা-বৌ-নানি-চাচি-ছেলে-মেয়েদের ডেকে আনে দলে দলে। অর্দ্ধেক রাত্রের মধ্যে ভদ্রাকে বাঁধতেই হবে।

সুন্দরের উৎসাহ অপরিসীম। সুন্দর ও ওসমান এক আওয়াজে নদীর পাড় কাঁপিয়ে জাগিয়ে তোলে সকলকে। মেয়েরা এবার কোমর বেঁধে বাঁশের চাঁচ কাটতে থাকে—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঝুড়ি মাথায় করে মাটি বয়ে নিয়ে যায়। ছেঁড়া চাটাই, ন্যাকড়া ও চাঁচে তাল পাকিয়ে ধপাধপ মাটি ফেলতে থাকে, বাঁশে ঘা মেরে মেরে বসিয়ে দেয় নদীর বুকে কয়েক হাত, দলনে মর্দ্দনে নদীর জল ঘোলাটে কাদা হয়ে যায়।

ভদ্রা হার মেনে বাঁধের ওপাশে ফুলে ফুঁপিয়ে ওঠে, চূর্ণ জলস্রোতে আবার মিলিয়ে যায়!

ক্যালিফোর্ণিয়ার বোল্ডার, উক্রেইনের নীপার থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে তেহাজারি। ইলেক্‌ট্রিসিটি, ক্রেন্‌-ক্র্যাকার, লিফ্‌ট্‌ ষ্টীলের মতো হাজারগুণ শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক মজুর এর চতুঃসীমানায় নেই। ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্ল্যানিং-এর কলা-কৌশলও যা আর জলপড়া মন্ত্রপড়াও তাই। মাটি আর চাটাই দিয়ে, পেশী আর ঘাম দিয়ে গড়া এই ভদ্রার বাঁধ মানুষের বুকের বাঁধ, মুষ্টির বাঁধ।

দারোগাবাবু পরদিন সকালে এসে মুষ্টি তুলে' শাসিয়ে বললেন: 'ভাঙতে হবে বাঁধ'।

'ভাঙব না'—জবাব এল।

'হুকুম—'

'মানব না—'

বিষ্টু ঠাকুর, হলধর ও ওস্‌মানের হাতে হাতকড়া পড়ল। রঘুনন্দন চৌধুরী নালিশ করেছেন আদালতে। সাক্ষী জেলেরা, আর সাক্ষী এই গর্ব্বোদ্ধত ভদ্রার বাঁধ।

সমিতির খড়ের ঘরে ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর বসে দুঃসাহসী সুন্দর হাত নেড়ে মুখ নেড়ে সকলকে জানিয়ে দিল—'ঠাকুরের কথা—ভলাণ্টিয়ার চাই—লাঠিয়াল ভলাণ্টিয়ার। গ্রামের সব পথ রাতদিন পাহারা দিতে হবে। জেলেদের বুঝিয়ে বল্‌তে হবে—যেমন বাঁধ বেঁধেছি এক রাতে জান্‌ দিয়ে—অম্‌নি করে আবার সবাই মিলে এক রাতে খাল্‌ কেটে নৌকা ভেড়াবার ঘাট করে দেব—আদালতে জমিদারের পক্ষে সাক্ষী দিতে পারবে না—তাহ'লে ভদ্রার জলে তোমাদের ধড় ভেসে যাবে বেণীর দিকে'—

আদালতে জমিদারের সাক্ষী নেই। ইউনিয়ন বোর্ডের বৃদ্ধ প্রেসিডেণ্ট একা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আবোলতাবোল মুখস্থ বলে যায়। ম্যাজিষ্ট্রেট ভ্রূকুঁচ্‌কে বলেন—'ষ্টপ'—

জেলেরা জানিয়ে দেয়, নৌকা ভেড়াবার নূতন ঘাট তারা পেয়েছে—থাক বাঁধ—সাক্ষী তারা দেবে না—

বিষণ্ণবদনে রঘুনন্দন চৌধুরী কাছারি ঘরে বসে হাঁক দেন। বৃদ্ধ সিদ্ধেশ্বর বলির পাঁঠার মতো সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকেন। চৌধুরী মশাই বলেন:

'নায়েব ! তিন দিনের মধ্যে কাগজপত্তর বুঝিয়ে দিয়ে, তুমি দেশে রওয়ানা হবে—যাও—যাও বল্‌ছি সামনে থেকে—'

কয়েকমাস পরের কথা। সোনালি ধানের শীষগুলো ধানের ভারে নতশির। বাঁধবন্ধ ভদ্রা আর সিঁদ কেটে মাঠে ঢুকে ফসল খেতে পারে না। চিক্ চিক্ করছে রোদে। কাটার সময় এল। চাষীদের মুখে হাসি ফোটে, আবার ম্লান হয়ে যায়। কি হবে এই ক'টা ধানে—যে মাগ্‌গির দিন ! দেশে অরাজকতা এল কি ?

গ্রামের পথে কথা হয়—'কি হ'লো ?' খবরের কাগজে নাকি বলছে নূন তেলের গাড়ী করে কামান আসছে, বন্দুক আসছে, সেপাই আসছে। জাপানীরা নাকি এসেছে দেশের দরজা পর্য্যন্ত—চট্টলের কোল বরাবর। ফ্যাকাসে মুখে আর কথা যোগায় না।

ফিস্ ফিস্ কথা হয়। হাওয়াই জাহাজ উড়ে যায় তেহাজারীর মাথার উপর দিয়ে। হাত থেকে কাস্তে এলিয়ে পড়ে মাটির উপর, লাঙ্গলের বলদ থেমে যায় —কাৎ হয়ে হুঁকোর জল গড়িয়ে পড়ে, চেয়ে থাকে সব আকাশের দিকে—কে আসছে ?

আকাশে বিরাট পাখা ছড়িয়ে উড়ে আসছে সাগরপারের দেশ থেকে এক অতি-কায় দানব—বড় বড় নখ, বড় বড় থাবা—করাতের মতো দাঁতের পাটি—আগুনের মতো লক্‌লকে জিব্—। সোনার দেশ, সোনার মাটি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

পরওয়ানা এল একদিন ভোরে—গ্রাম ছাড়তে হবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। চাটগাঁয়ে বোমা পড়েছে—। মাত্র দু'টো নদীর ব্যবধান। তেহাজারিতে তাঁবু বসবে সৈন্যদের—অস্ত্রশস্ত্র গুলীগোলা জমা হবে।

বৃদ্ধদের হাহাকার, বৌ-ঝিদের কান্নার রোলে ফেটে গেল আকাশ। আকাশ তবু স্তব্ধ, নীরেট নীল।

হাকিম সাহেবের বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে সকলে সমস্বরে কেঁদে উঠলো—'সাত দিন সময় চাই—হুজুর।' রহমান সাহেব বেরিয়ে এসে বল্লেন—'তোমাদের তো আগেই বলেছিলাম—বাঁধ বাঁধার আগে—। তা' হবে না—কাল ভোরেই গ্রাম তোমাদের ছাড়তে হবে—'

গ্রামের জেলেরাও দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। নৌকা তাদের ঘাটে নেই, ভদ্রায় নেই, বেণীতে নেই—কেড়ে নিয়েছে সৈন্যরা। সকলে বললে: 'খাব কি হুজুর? যাব কোথায়? বিদেশে কে দেবে ফসল ক্ষেত, বাসের ভিটে?'

'দূরের গ্রামে যাও—তোমরা সকলেই টাকা পাবে—ভয় নেই।'

বাংলো থেকে বিশ মাইল হেঁটে জেলার সহরে গেল তারা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে। বললে: 'সাতদিন সময় চাই হুজুর।' তিন দিনের সময় ম্যাজিষ্ট্রেট মঞ্জুর করলেন।

সেই ক্ষেত। সেই বাঁধ। সেই ভদ্রা।

মক্কা-মেদিনা-গয়া-কাশী-জগন্নাথের তীর্থযাত্রী কি এরা? তিন দিনে মাঠের ফসল অর্দ্ধেক কাটা হয়েছে—বাকি অর্দ্ধেক পড়ে' রয়েছে মাঠে। আজ আর তারা দুলছে না বাতাসে। বাতাস রুদ্ধ।

ওরা লুঠ করবে ধান, লুঠ করবে ঘরের বৌ, পুড়িয়ে দেবে ঘর—। দেব না একটা ধান,—চলার পথে হেঁকে বল্‌লে সুন্দর আর ওস্‌মান।

ছেঁড়া কাঁথা আর ন্যাকড়ার উপর কেরোসিন ছড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দিল ওস্‌মান ধানের ক্ষেতে।

'ক্ষেতে আগুন—হা আল্লা!' আকাশের দিকে চেয়ে বুক চাপ্‌ড়ে কেঁদে উঠ্‌লো ওস্‌মানের বৃদ্ধ চাচা জমির।

'ভদ্রার বাঁধ ভাঙতে হবে!' সুন্দর রুখে গেল। হলধরের বুক ফেটে জল এল চোখে। নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুন্দর—হাতে লাঠি, সাবল।

ভদ্রার নির্ম্মম প্রতিশোধ!

গরুর পাল চলেছে সামনে—। হাম্বা ডাকে কেঁপে উঠছে গাছপালা।

পিছনে বৌ-ঝি ছেলে-মেয়েদের কান্না দূর গ্রাম পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হোচ্ছে।

জেলেরা চলেছে জাল কাঁধে। সাক্ষী তারা দেয়নি।

তার পিছনে চলেছে বৃদ্ধ জমির বুক চাপড়াতে চাপড়াতে, আর হলধর আকাশের দিকে চেয়ে বার বার বলছে—'একি হ'ল ভগবান! কোন্ রসাতলে যাচ্ছি?'

সুন্দর ও ওস্‌মান আর সকলকে দলে টেনে আওয়াজ তুলে বলছে: আবার বাঁধ বাঁধব—জমি চষব—ফসল কাটব—এই গাঁয়ে—কল দিয়ে, বিদ্যুৎ দিয়ে—ইস্পাত দিয়ে—দেব না আজ দুষমন্‌কে কিছু—। জোরে জোরে পা ফেল্ ভাই—পা ফেল্—জোরে চল্—

সুদীর্ঘ দিগ্বলয়লীন প্রান্তরে মেঠো পথের উপর তেহাজারির গ্রাম মানুষের কাঁধে, পিঠে ও মাথায় মিলিয়ে গেল সামনে। পিছনে রইল ভাঙ্গা বাঁধ, পোড়া মাঠ ও গ্রামভরা ছাই, আকাশে উড্ডীন দৈত্যের মুখের গ্রাস।

১৯৪৩

"মা গো! বাঁচিয়ে দে—"

প্রবাদ আছে, সতীর বাম কনুই ফুঁড়ে উঠেছেন চতুর্ভুর্জা পিতলের মা মঙ্গলচণ্ডী। পাশেই রয়েছেন কালো তেলচুক্চুকে কষ্টিপাথরের ভৈরব নটেশ্বর। বেলপাতা, দুধ আর গঙ্গাজলের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে নটেশ্বর পাথুরে চোখ বুজে বসে আছেন। মন্দিরের সামনে ছোট্ট জনতা। আধ-বসনা, মলিনা, লজ্জাবনতা মায়েরা, শুক্নো মুখ, রুক্ষ চুল, কোলে হাড়-লিক্লিকে শিশু। চোয়াল-উঁচু, চোয়াড়, রূঢ়শ্রী পুরুষের দল, এক চোখে তাদের আগুন, আর একচোখে ভয়। ঘোলাটে-চোখো, নতপিঠ বৃদ্ধবৃদ্ধা, সর্ব্বাঙ্গে তাদের আতঙ্ক।

শনিমঙ্গলবারের গভীর রাতে মা মঙ্গলচণ্ডীকে সকলে মন্দিরের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে ডাকে 'মা, মা,' বলে,' নটেশ্বরের মাথায় বিল্বপত্র আর গঙ্গাজল ঢেলে বলে, "বাবা নটেশ্বর, অভয় দাও বাবা।" গ্রামের এই মন্দিরে ভৈরব নটেশ্বরের পাশে মা চণ্ডী পাঁচশ বছরের বেশি অধিষ্ঠিতা রয়েছেন। বর্গীরা এল, পাঠানেরা এল, নবাবরা একে একে এল গেল, গঙ্গার বুক বজরায় ভরে গেল, ঘোড়ার পিঠে চড়ে খট্ খট্ ক'রে কোন্ দেশের বণিকরা এল কটা-চোখো, লাল-মুখো, বিধর্ম্মী, ম্লেচ্ছ। কত হাজার হাজার লোকের সুখদুঃখ কান্নাহাসি, সাধনভজন, জন্মমৃত্যু নটেশ্বর ও মঙ্গলচণ্ডী দেখলেন, শুনলেন একটুও নড়লেন না। তবু সবাই হেঁট হয়ে মেনে নিল, তাদের পিতলের মায়ের প্রাণ আছে, কষ্টিপাথরের নটেশ্বরবাবার পাথুরে বুক তাদেরই মতো ধুক্‌ধুক্ করে।

আজ শনিবার। দুপুর রাতে গাঁ-সুদ্ধু সকলে এসে জড়ো হয়েছে মন্দিরে। ছেলেবুড়ো, মেয়ে-পুরুষ সকলে। লণ্ঠন নেই, লাঠি আছে হাতে। আলো নেই, তেল নেই। গাছের শুকনো পাতা জড়ো ক'রে আগুন জ্বালিয়ে সকলে মুখ দেখছে মা মঙ্গলচণ্ডীর, আর পৌষের রাতে আগুন পোহাচ্ছে। দূরে দলছাড়া হয়ে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে কেলো, চোরের মতো। গোলা-বারুদের কারখানায় কাজ নিয়েছে কেলো, গাঁয়ের সকলের গায়ের জ্বালা, বলে "কেলোর এবার মরার পাখ্‌না উঠেছে।" কেলোর বুড়ী মা দু'বেলা এসে মঙ্গলচণ্ডীর কাছে মানৎ ক'রে যায়—'আধখানা পাঁঠা দেব মা, কেলোর সুমতি দাও'।

হাফ্‌প্যাণ্ট পরে' কেলো মাঝে মাঝে গাঁয়ে সকলের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায়। ষ্টীলের হেল্‌মেট্‌টা একটু বেঁকিয়ে কোমরে হাত দিয়ে শ্রোতাদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে: "বলি ক'রকমের বোমা আছে জানো তোমরা,

হ্যাগা?" একজন মুখ-ঝট্‌কা দিয়ে ওঠেঃ "যা, যাঃ, ফুটানি মারিস্ নে কেলো, —ভারি আমার যুদ্ধুফেরৎ কাপ্‌তেন রে—"। ভ্রূক্ষেপ না ক'রে কেলো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বলেঃ "কলা জানো। ব'লে যাচ্ছি, হাত গুণে যাও—এক আগুনে বোমা, দুই ফস্‌ফস্ বোমা, তিন বিষফোঁড়া বোমা"—সকলে হো-হো ক'রে হেসে ওঠে। কেলো কিন্তু দমবার নয়, বলতে বলতে হাঁফিয়ে ওঠে—যুদ্ধের কথা, কারখানার লক্ষ লক্ষ গোলার কথা, বড় বড় কামান বসানোর কথা, সেপাইসামন্তের কথা, বোমার কথা। রাতে কেলো প্রতিবেশীর দরজায় গিয়ে ডাকেঃ "পাঁচুখুড়ো বাড়ী আছ নাকি, ও খুড়ো!" দরজা খোলে, খুড়ো নয়, খুড়ী। সামনে দাঁড়ানো কেলোর আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে খুড়ী ঝাঁঝিয়ে ওঠেঃ "আ-মরণ, আবার ধরাচুড়ো পরে এসেছেন—দরজার ঝন্‌কাঠ পেইরেছিস্ কি ঠ্যাং বেড়িয়ে ভেঙ্গে দেব, দূর হ, দূর হ,!" কেলো বলেঃ "বাপ্‌রে বাপ্—গরম তেলে লঙ্কা ফোড়নের মতো চিড়বিড় ক'রে ওঠো কেন খুড়ী? শোনোই না, বলি ঘরের পাশে গর্ত্ত কেটেছো, যারে বলে সিলিট্ টেরেঞ্চ?" খুড়ী বলেঃ "কেন রে ড্যাকরা, মোছোলমানের মতো গোর দিবি নাকি?" কেলো বলেঃ "গোর আমি দেব কেন? বালাই ষাট্—বোমাই দেবে, হেঁদুমোছোলমান সবাইকে একত্তর গোর দেবে, দাঁড়াও—তখন তোমার মঙ্গলচণ্ডী আর লটেশ্বর কেমন ঠেকায় দেখব।" "দূর হ হতচ্ছাড়া, দূর হ" ব'লে তেড়ে আসে খুড়ী। "মঙ্গলচণ্ডী ছেড়ে গর্ত্ত কাট খুড়ী, এ তোমার ভল্লুকে জ্বর নয়, বোমা, বোমা, মঙ্গলচণ্ডীর সাধ্যি নেই বাঁচায়—", বলতে বলতে কেলো অদৃশ্য হয়ে যায়।

এমনি ক'রে কেলো সারাটা গ্রাম ক'মাস ধ'রে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছে। কয়েকজন তরুণ জেলে-নাপিত-কুমোর-চাষীর ছেলে তার দলে ভিড়েছে, বাকি

সকলে উঠতে বসতে কেলোর মুণ্ডুপাত না ক'রে জল খায় না। মা মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে মাথা ঠুকে ঠুকে কেলোর মার কপালে কালচিটে পড়ে গেল, কেলোর সুমতি দিল না মঙ্গলচণ্ডী। 'যমের অখাদ্য' কেলো দাঁত বার ক'রে খিল্ খিল্ ক'রে হাসে, আর গাঁয়ের সকলে তেলেবেগুনে চটে যায়।

আজ গাঁ-সুদ্ধু সকলে এসেছে মা মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে। কেলোও এসেছে সকলের সঙ্গে। গত রাত্রির সাইরেণের কথা মনে পড়ছে। এতদিন পরে সত্যিকার সাইরেণ, সহরতলীতে বোমা পড়েছে। রাখালের পালে বাঘ পড়েছে, কেলো ভাবে আর বুক দুর্ দুর্ করে ভয়ে। আজ সব ভুলে গিয়ে কেলো মঙ্গলচণ্ডীর পিতলের চক্‌চকে মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে সকাতর প্রার্থনা জানায়: 'মাগো, বাঁচিয়ে দে মা!' মন্দিরের সামনে কেলোর মা মাথা হেঁট ক'রে উবু হয়ে রয়েছে। মন্দিরের চারিদিকে মাঝে মাঝে ছেলেমেয়ে-বুড়ো সকলে সমস্বরে 'মা, মা' বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ছে। মন্দিরের ভিতর মা মঙ্গলচণ্ডীর সামনে যোগাসনে ধ্যানমগ্ন ভুবনঠাকুর গা-ঝাড়া দিয়ে 'মা, মা' বলে ডাক দিয়েছেন। আশপাশের গাছপালা কেঁপে উঠ্‌লো। ভুবনঠাকুর ভিতর থেকে হাত ইসারা করলেন ঢাকিদের। জনতা হাঁক দিল, 'ঢাক বাজাও'।

ঢাকের আওয়াজ আর মা, মা শব্দ ভেদ ক'রে কেলোর বিকট চীৎকার শোনা গেল: "ঢাক থামাও।" থম্‌কে দাঁড়াল জনতা, থেমে গেল ঢুলির কাঠি, ভুবনঠাকুরের আরতির ঘণ্টা হাতে আড়ষ্ট হয়ে রইল। কেলো প্রাণপণে চীৎকার করছে: "ফিরে যাও সব, ঘরে যাও"। বোবা জনতা অবাক হয়ে দেখল একবার আকাশের দিকে। চারিদিক আলোয় আলো, ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে, কখন কেউ জানে না।

গত রাত্রির মতো কাছের গোলাবারুদের কারখানা থেকে, থানা থেকে, সহরতলীর চারিদিক থেকে রাতের নিস্তব্ধতা চিরে সাইরেণ বাজল। করুণ একটা কান্নার সুর ঢেউয়ের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে আকাশে-বাতাসে। যেন কোন্ দানবের বুকে বল্লম বিঁধেছে, আর্ত্তনাদ করছে দানব।

ভীত, সন্ত্রস্ত, পলায়মান জনতার হল্লার মধ্যে শোনা গেল কেলোর মা চেঁচিয়ে ডাকছে: "ও কেলো, কেলো, ফিরে আয় বাবা!" দূর থেকে কেলোর গলা শোনা গেল: "ঘরে যাও, এ-আর-পি ইস্‌টিশনে যাচ্ছি।" ভুবনঠাকুর মন্দিরের ভিতর থেকে হেঁকে বল্লেন: "ফিরে যাও সব, ভয় নেই—আমি মন্দিরেই থাকব, মায়ের পূজো বন্ধ হবে না।"

মাঠের উপর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে পাঁচু খুড়ো পাশের হিরু নাপিতকে জানিয়ে দিল: "হা অন্ন! হা বস্তর! তার ওপড় আকাশ থেকে আগুন বৃষ্টি, এবারে কলির শেষ হিরু ভাই, পাঁজিতে সব লিখে দিয়েছে—।" কেলোর মার ডাক তখনও শোনা যাচ্ছে: "ও কেলো, কেলো—"

দানবের বুকফাটা কান্না থেমেছে অনেকক্ষণ।

বোঁ-ওঁ-ওঁ শব্দ হচ্ছে দূরে, বহুদূরে, মাথার উপর। বোঁ-ওঁ ওঁ-ওঁ। গাছের পাতা পর্য্যন্ত নড়ে না।

'মা মঙ্গলচণ্ডী, মাগো, বাঁচিয়ে দে'—গলা ভাঙ্গা, কাঁপছে, মুখ সাদা, হাত-পা হিম। গুম্ গুম্ গুম্ শব্দ হচ্ছে আকাশে। উড়ন্ত দানবের পাখার শব্দ। দুম্-দুমদাম্ দম্-দুম্‌দুম্—

মাটি কেঁপে উঠলো। চালাঘর, গাছপালা থর থর ক'রে কেঁপে উঠলো। গরু-বাছুর-ছাগল-মানুষের হঠাৎ ভয়ার্ত্ত চীৎকারে এক একবার নিস্পন্দ নিস্তব্ধতা

ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আবার সব ঠাণ্ডা, খুব দূরে গুম্‌-গুম্‌-গুম্‌ শব্দ, সব হিম, অসাড়।

মন্দিরের চারিদিকে গ্রামের ছেলেমেয়ে-বুড়োদের ভিড় জমেছে। পাঁচশ' বছরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দির ধূলোয় গুড়িয়ে গিয়েছে। মা মঙ্গলচণ্ডীর পিতলের মুখ, হাত-পা, দেহ তুম্‌ড়ে বেঁকে পড়ে রয়েছে একদিকে, আর একদিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ঝল্‌সানো ভুবনঠাকুরের বীভৎস দেহ। বাতাসে বিষের গন্ধ। নটেশ্বর দশহাত এক ডোবার তলায় কোথা দিয়ে পাতালে প্রবেশ করেছেন। ডোবা থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে আকাশে।

জনতার ভিতর থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, "মা নেই"। কথাটা চাবুকের মতো লাগল বুকেপিঠে, শিউরে উঠ্‌লো সকলে। আর একদল বল্লে: "আমরা আছি"। মা, মা, শব্দে ফেটে গেল চারিদিক।

দূর থেকে দৌড়ে আসছে, ও-কে? কাঁদতে কাঁদতে? কেলোর মা, হাতের মুঠোয় কেলোর ছিন্নমুণ্ড। আঁৎকে উঠ্‌লো সকলে।

থানার দারোগা, পুলিশ, এ-আর-পি ওয়ার্ডেনরা একদিকে দাঁড়িয়ে আছে। দৌড়ে এসে চুলের ঝুঁটিসুদ্ধু কেলোর ছিন্নমুণ্ডটা তুলে ধরে' বুড়ী হাঁউমাঁউ ক'রে কেঁদে উঠলো—"বাঁচিয়ে দাও দারোগাবাবু, আমার কেলোকে ওষুধ দাও"। বুড়ীর দিকে একবার ফিরে দারোগাবাবু মাটিতে পা-ঠুকে সিগ্রেটের ধোঁয়া ছাড়লেন। একজন ওয়ার্ডেন বলল: "এ-আর-পি ষ্টেশন যাবার পথে স্‌প্লিণ্টারে টুটুক্‌রো হয়েছে"।

কেলোর মা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে গেল মন্দিরের দিকে। মন্দির নেই। ঝল্‌সানো তুম্‌ড়ানো পিতলের মা মঙ্গলচণ্ডী পড়ে

রয়েছে দূরে। আছড়ে কেঁদে পড়ল কেলোর মাঃ "মাগো, বাঁচিয়ে দে"—

দারোগার ইসারায় জমাদার কেলোর ছিন্নমুণ্ড বুড়ীর হাত থেকে ছিনিয়ে ফেলে দিল দূরে। দারোগাবাবু নোটবই বার ক'রে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তোর ছেলের নাম কি বুড়ী?" পাঁচুখুড়ো তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেঃ "নাম কেলো"। "ড্যাম্ কেলো"—দারোগাবাবু বললেন, "পদবী কি?"

পাঁচুখুড়ো একবার সকলের মুখের দিয়ে চেয়ে দারোগাবাবুর দিকে ফিরে বলল: "পদবী?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, পদবী—"

পাঁচুখুড়ো ভড়্কে গিয়ে বললেঃ "আমাদের কেলো—"

চারিদিকের 'মাগো, বাঁচিয়ে দে' কান্নার শব্দের মধ্যে দারোগাবাবু মুখ ভেংচে বললেনঃ "ষ্টুপিড্"।

১৯৪৩

লুলু

কপালের কালো দাগটা এখনো মিলিয়ে যায়নি। ঘুমন্ত নন্দর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল লক্ষণ। নন্দ—নন্দ—নন্দরাণী! ভোরের ক্ষীণ আলো জান্‌লার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে নন্দর মুখের উপর। শিথিল বেণীর মাটিতে লোটানো মুখটা আলো-অন্ধকারে মনে হচ্ছে সাপের ফণা। পাশে শুয়ে রয়েছে লক্ষণের পাঁচটি ছেলে কুণ্ডলী পাকিয়ে। কেউটের বাচ্চা। কার সাধ্যি স্পর্শ করে। একসঙ্গে ফণা তুলে তেড়ে আসবে সব—মায়ে বাচ্চায় মিলে। আহা! মিথ্যে একটা রঙের বাড়ি মেরেছিল লক্ষণ কাল নন্দর কপালে। কিন্তু কি দরকার ছিল কাজ থেকে ফেরার

সঙ্গে সঙ্গে ঐ কথা তাকে শোনানোর! রোজ সেই এক কথা, এক সুরে—

দিন নেই রাত নেই, সময় নেই অসময় নেই, সেই একঘেয়ে কথা। চাল নেই—কয়লা নেই—নুন নেই—সেই একসুর—মাঝরাতের বীভৎস 'বল-হরি-হরি-বোল'। দশ ঘণ্টা দু'টো ঠ্যাং বন্ বন্ ক'রে ঘুরিয়ে সন্ধ্যের সময় ঘরে ফিরব—কিড়িং কিড়িং—অমনি খেকীর দল সব তেড়ে আসবে। তারপর সেই কেঁউ কেঁউ—সারারাত ঘ্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যানোর ঘ্যান্, আর সারাদিন টক্কা-টক্কা-টরে-টরে—।

ভোরের আলো আরও একটু পরিষ্কার হয়েছে। নিজের দুর্ব্যবহারের উপর যুক্তির পট্টি লাগিয়ে স্বস্তি পেল লক্ষণ। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল ভিতরের বারান্দার দিকে। ডানদিকের ঘেরা রান্নাঘরের দিকে চেয়ে দেখল বহুদিনের পুরাণো একমণি মাটির জালাটা অপরাধীর মতো কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, চারিদিকে তার শুক্‌নো তেজপাতা আর সরষে ছড়ানো। লুলুর কীর্ত্তি। লুলুর উপদ্রবে আর তিষ্ঠোবার জো নেই। পাতের ধারে বসে' যাহোক্ সপ্তাহে দু'টো দিন তবু মাছের কাঁটাটা-আঁসটা আড়দাঁতের ফাঁকে ফেলে চিবোনো চল্‌তো, কট্ কট্ ক'রে উর্দ্ধমুখী লোমশ লেজটা গায়ে বুলিয়ে আব্দারে শ্লেষ্মা রুগীর মতো ঘড়্ ঘড়্ করলেও বিরক্ত হ'ত না কেউ—আজ লুলুর দৌরাত্ম্যের সীমা নেই। ভাত মেখে সামনে দিলে লুলু শুঁকে শুঁকে হয়রাণ হয়—থাবা দিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে দেখে—আধসিদ্ধ ডালের দানার দিকে চেয়ে চেয়ে লুলু ডাকতে থাকে—ম্যাউ—অ্যাউ—

নিমকহারাম হুলোটাকে বিদায় করতে হবে এবার—লক্ষণ ভাবে। করুণভাবে লক্ষণের মুখের দিকে চেয়ে জিব্ দিয়ে গোঁফটা একবার চেটে নিয়ে লুলু ডাকে 'ম্যাউ', লক্ষণের মায়া হয়।

মাটির জালার মুখটা ফাঁক করা। উঁকি মেরে দেখতে ভয় হয়—ভিতরে হয়ত অগাধ অন্ধকার, সূর্য্যও হার মেনেছে, ঢুকতে পারেনি তার মধ্যে। সন্তর্পণে এগিয়ে এল লক্ষণ। উঁকি দিয়ে দেখল ভাঁড়ে মা ভবানী। কি একটা তিড়িং ক'রে লাফ দিয়ে পড়ল মাটিতে। ইঁদুর। উপরের ঝুলে-ভরা তেকাঠায় হাড়ির মুখে এতক্ষণ ওঁৎ পেতে বসে' ছিল লুলু, সাড়াশব্দ দেয়নি। সশব্দে হাড়িকুড়ি মাটিতে ফেলে ভেঙেচুরে লাফ দিয়ে পড়ল লুলু, ধাওয়া করল ইঁদুরটাকে।

শূন্য হাড়িকুড়ি আর ঘরের গর্ত্তগোদা পাহারা দেওয়া আজকাল লুলুর প্রধান কাজ। কাজ কঠিন। খালি পেটে অবসন্ন দেহমন নিয়ে লুলু তার দৈনন্দিন কাজ করে, বসে' বসে' ঝিমোয়, নন্দরাণীর বাচ্চাদের সঙ্গে তার মধ্যে খানিকটা ঝাঁপাঝাঁপিও করে। কিন্তু সকলের ঔদাসীন্য ক্রমেই লুলুর অসহ্য ঠেক্‌ছে।

লক্ষণের নৈশাহারের সময় কাছে এসে লুলু গায়ে লেজ বুলিয়ে ঘড়্‌ঘড়্‌ করে। কান ধ'রে লক্ষণ দূরে আছাড় দিয়ে ফেলে দেয়। ঝুপ্ ক'রে খাবার উপর ভর দিয়ে বসে' পড়ে' লুলু করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে লক্ষণের খাবার থালার দিকে। চোখ দু'টো তার অন্ধকারে জ্বলে, না জলে ছল্ ছল্ করে, সেদিকে কেউ চেয়েও দেখে না।

এদিকে লুলুর হাড়িভাঙার শব্দে ঘুম ভেঙেছে নন্দরাণীর আর দুলালদের। মোড়া দিয়ে উঠেছে সব ঠেলে। ধনুকের মতো বেঁকে পান্‌তা স্বর টেনে বললে, 'ব্যাবা'—। বাবা লক্ষণ তার অনুকরণে আর একবার 'ব্যাবা' বলে পান্‌তার গর্দান ধরে নামাল মেঝের উপর। সব ক'টাকে নামিয়ে দাঁড় করাল একসারিতে।

"গা, গা, গান গা, আজ রবিবার মনে নেই? যেতে হবে এখনই"—লক্ষণ বলল। হাতে তালি দিতে দিতে আরম্ভ হ'ল গান :

তাই—তাই—তাই
সার দিয়ে দাঁড়াই
চাল নাই, তেল নাই
পোড়া চোখে ঘুম নাই
প্রাণ বলে পালাই পালাই
ভাই—ভাই— চল্ যাই—

(তাল-ফেরতা)

এক-দুই-তিন এক-দুই-তিন
চাল চাই, নুন চাই, চাই কেরোসিন্
চার-পাঁচ-ছয় চার-পাঁচ-ছয়
আফ্রিকাতে ভুট্টা আছে, নেই আর ভয়।

ঘুম-ভাঙা ফোলা-ফোলা দু'টো চোখের দৃষ্টি সজোরে লক্ষণের মুখের উপর নিক্ষেপ ক'রে নন্দরাণী বলল : "আ-হা-হা, রঙ্গ ছাখ—ধেড়ে সঙ সেজে ওদের নিয়ে রাস্তায় বেরোও—জেলেপাড়ার সঙকেও হার মানাবে—চাই কি গরমেণ্টের লোক গান শুনে তোমাকেই আগে ডেকে চাল দেবে—"। কথা ক'টা বল্‌তে বল্‌তে উঠে দাঁড়াল নন্দরাণী।

লক্ষণের মনটা ধোঁয়াচ্ছিল ক'দিন ধরে'। কে যেন জল ঢেলে দিল তার উপর। নন্দ যে এত তাড়াতাড়ি সামলে উঠবে সে কল্পনাও করেনি। আর যাই হোক্—নন্দর মনটা ভাল, খরস্রোতা নদীর পারের মতো। মাড়িয়ে যাও, দাগ কেটে যাও, সাবল দিয়ে খুঁড়ে রাখো—আবার

পরক্ষণেই স্রোতের জলে সব ধুয়ে মুছে যেমন তেমনি ভরাট হয়ে যাবে।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো লক্ষণ। দু'হাত দিয়ে নন্দর কানের পাশ দু'টো চেপে ধরে' ঝাঁকানি দিতে দিতে গানের সুর টেনে ব'লে চলল—

ওগো আমার নন্দরাণী, গাল-ফোলানি,
চুপ্‌টি ক'রে শোন বলি,
বেঁচে থাকলে রেশন পাব,
মরে গেলে পেনশন্ পাব,
লড়াই চল্‌লে ভাতা পাব,
কিসের ভয়!—

ছেলেদের গান থামেনি, তারা গাইছে—

চার-পাঁচ-ছয় চার-পাঁচ-ছয়
জংলা দেশে ভুট্টা আছে, নেই আর ভয়—।

লক্ষণ বল্‌ছে সুর ক'রে—ভয় কি গো নন্দরাণী, বলি শোন—

বিলেত থেকে আস্‌ছে উড়ে
খাস-বিলিতি ভোজন-দেড়ে
দিল্লীতে পাকাবে বসে' লাড্ডু—
কসে' গাও লাটের জয়, কিসের ভয়?
বাজাও গুপী—গাব্ গুবাগুব্ গাড্ডু।

'ছাড়, ছাড়, আঃ'—নন্দ চেঁচিয়ে উঠলো। ঘর থেকে বেরুবার সময় রূপোর ঝুম্‌কো দু'টো দুলিয়ে ব'লে গেল নন্দ: "পাঁচছেলের বাপ্—এখনও খোকামি গেল না—সঙ সেজে রঙ্গ' করা হচ্ছে—"

ছেনো এতক্ষণ গান গাইতে গাইতে মিট্‌মিট্ ক'রে চেয়ে দেখছিল বাবা-মা'র কাণ্ডকারখানা। ভারি তুখড় ছেলে ছেনো, হাড়ে হাড়ে বদ্‌মায়েসি। লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে ছেনো হাত তুলে বলল: "আমাকে কর বাবা?" "কি করব?" লক্ষণ বলল। "ঐ যে মা'কে করছিলে", ছেনো যেন লজ্জায় আধমরা হয়ে গেল। 'ও' বলে লক্ষণ ছেনোর কানের পাশ দু'টো চেপে ধ'রে চেঁড়ে তুলল উপরে, "ছেনো—ছেনো—ছেন্‌কু—ছেনো—"

"বেলা হচ্ছে না? রাত থেকে এসে বসে আছে সব, তোমার এখনও সময় হ'ল না—ত্থাখোগে গিয়ে আধ মাইল লোকের লাইন হয়ে গিয়েছে—আজ আর কিছু জুটছে না কপালে—"

এতগুলো কথা নন্দর মুখ থেকে হঠাৎ তীরবেগে লক্ষণের উপর বর্ষিত হবার পর লক্ষণের সম্বিৎ ফিরে এল। ছেলেগুলোকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার সময় লক্ষণ বলল: "ধনাকে কোলে ক'রে তুমি যাও কয়লার ডিপোতে। আর শোন, তোমার সখের রূপোর ঝুম্‌কোটা খুলে যেও, বুঝলে?" "কেন?" নন্দ সুধাল। "চিলে ছোঁ মারতে পারে—" ব'লে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল লক্ষণ।

এক কোণে একটি ইঁদুরের গর্ত্তের ধারে ব'সে ঝিমুচ্ছিল লুলু। শব্দ পেয়ে ছেলেগুলোর পিছু পিছু গলিটার মাথা পর্য্যন্ত এগিয়ে গেল। কেউ ফিরেও চাইল না তার দিকে।

কয়লার ডিপোর পথে যাবার সময় নন্দ ভাবছিল: "একেবারে পান্‌তারও বাড়া—কোনো হুঁস নেই, কেবল হাসিঠাট্টা—লোক কেঁদে কূল পাচ্ছে না—"

কোলেতে ধনা তেলেভাজা ফুলুরি খাবার বায়না ধরেছে: "খাব"—ঘ্যান্, ঘ্যান্ ঘ্যানোর ঘ্যান্—···

টক্কা-টক্কা-টরে-টরে—

একদফা টেলি-বিলি ক'রে এসে লক্ষণ একদিকে সাইকেলটা রেখে দাঁড়িয়েছিল চুপ ক'রে। কেরাণীবাবুরা একে একে এসে ভিড় করছে নীচের তলার রেষ্টুরেণ্টে ও খাবারের দোকানে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক কেরাণী-মার্কা তর্কবিতর্ক চলছে। উপর থেকে নেমে এলেন টি-এম হরেনবাবু। লক্ষণকে বিমর্ষ দেখে ডেকে বললেন: "কি লক্ষণ, ভাবছিস কি? আর ভাবনা কি? বিলেত থেকে ফুড স্পেশালিষ্ট আসছে, আফ্রিকা থেকে ভুট্টা আসছে—"। তরমুজাকৃতি হরেনবাবু এ-কথাটা প্রায় রোজই একবার পরিচিত 'ডেলিভারি' পিওনদের শুনিয়ে দেন। লক্ষণ বলে: "তা তো শুনছি বাবু, অদ্দিন বাঁচলে হয়—"। "যা যাঃ, ভারি মাতব্বর হয়েছিস দেখছি, রেশন পাচ্ছিস্ আবার কি রে?" প্যাণ্টের পকেট থেকে কৌটো বার ক'রে দু'টো পান মুখে দিয়ে হরেনবাবু চলে গেলেন।

রেষ্টুরেণ্টে তুমুল তর্ক চলেছে কেরাণীবাবুদের মধ্যে। তর্কের উৎস হ'চ্ছে দু'পয়সার পরেটার দাম দু'আনা। কে একজন চড়া গলায় বল্‌ছে: "আরে ওসব ছেঁড়া কথা রাখুন মশাই—ছাপ্ বললেই নোট ছাপানো যায়, বাড়াও বললেই তো আর ফসল বাড়ে না—সেদিকে কারও হুঁস নেই, সব দিল্লীর দিকে হাত পেতে আছে—"

অর্থনীতির অনার্স গ্র্যাজুয়েট যুবক কেরাণী বিমানবিহারী বলল: "ইন্‌ফ্লেশন্, মশাই ইন্‌ফ্লেশন, যাতে জার্ম্মানি সাবাড় হয়ে গেছ্‌ল—"

প্রৌঢ় কেরাণী তারিণীবাবু চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে চোখ বড় বড় ক'রে যুবকের দিকে ফিরে বললেন: "তাহলে কি আর উপায় নেই মশাই?"

খাবার ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে লক্ষণ ভাবছেঃ "পেনশন-রেশন-ইনফ্লেশন—জয় হোক ইউনাইটেড্ নেশন্'। টক্কা-টক্কা-টরে-টরে—মাথার মধ্যে বোল্‌তার চাকে ঢিল।

আজ ক'দিন লুলু নিখোঁজ হয়েছে।

দিনরাত পান্‌তা প্যান্ প্যান্ করে, ভাবে বাবা বোধ হয় বস্তায় বেঁধে ফেলে দিয়েছে কোথাও। ঘরের চারিদিকে মাটি ও গর্ত্তে ভরা। রাতে লক্ষণের ঘুম ভেঙে যায়, গায়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে যায় ছোট নেংটিগুলো—সারারাত কিচিরমিচির হুড়ুম্‌দাড়ুম্ শব্দ হয়—

লুলু নেই সেকথা জানিয়ে দিচ্ছে এরা।

চোখ বেঁধে, বস্তায় পুরে লুলুকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে লক্ষণ এ-রাস্তা সে-রাস্তার কোণে। পিচের গন্ধ, হাজার হাজার মানুষের পায়ের গন্ধ শুঁকে শুঁকে লুলু সন্ধ্যার আগেই হাজির হয়েছে লক্ষণের ঘরে। খাবার সময় নন্দত্লালরা যখন পোঁ ধরে এটা খাব, ওটা কোথায়, লক্ষণের সঙ্গে নন্দর, নিত্য-কলহ স্থরু হয়, মুখ ফিরিয়ে আঁচলের খুঁট দিয়ে নন্দ চোখের জল মোছে—লুলু তখন এককোণে চুপটি ক'রে বসে কানখাড়া ক'রে শোনে সব, আর ভাবুক দার্শনিকের মতো চোখ বুজে উপলব্ধি করে সঙ্কটের স্বরূপ।

নন্দ বলেঃ "আসবে না তো যাবে কোথায়? বেড়াল পোষার সখ নেই কারও এখন—"

লক্ষণের মন ভারাক্রান্ত। জলভরা মেঘের মতো দুশ্চিন্তা থম্ থম্ করছে মনের কোণে। ঘরেতে নন্দরাণী প্রায়-বিবসনা, ছেলেগুলোর আব্‌দার ও

প্যানপ্যানানি অসহ্য, বুকের তলায় পেট গর্ত্তে গিয়েছে ; গর্ত্তের মধ্যে ইঁদুরের উঁকিঝুঁকিতে দুর্ভিক্ষের ঘন ঘন তার আসছে।

সন্ধ্যার সময় লক্ষণ ঘরে ফিরছে, সঙ্গে আসছে ছেলেগুলো। ষ্টোর্স থেকে সপ্তাহের রেশন আনতে তারা গিয়েছিল বাবার অফিসে। রাস্তায় ছেনো বলছে : "তুমি এত বড় অপিসে কাজ করো বাবা ?" লক্ষণ বলল : "হুঁ"। ছেনোর বুকটা ফুলে উঠলে, বলল : "নন্তুর বাবার অপিস ছোট, না বাবা ?" লক্ষণ বলল : "হুঁ"।

ছেনো উঠেছে বাবুর কাঁধে, কানু সাইকেলের সীটে, ভুলু রডের উপর। পান্তা হেঁটে চলেছে আর মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াচ্ছে। অন্ধকারে বিড়ালের চোখ জ্বলছে এখানে ওখানে—লুলুর চোখ।

বড় বড় বাঘের মতো জ্বল জ্বলে চোখ বার ক'রে হুস হুস ক'রে ছুটে চলেছে মিলিটারী লরীগুলো।

লক্ষণ বলল : "গান গা শুনি—আস্তে আস্তে গা—"।

চার-পাঁচ-ছয়, চার-পাঁছ-ছয়
জংলা দেশে ভুট্টা আছে, নেই আর ভয়।

অন্ধকারে শিশুকণ্ঠের ক্ষীণ কোরাস শুনতে লক্ষণের আজ ভাল লাগছিল খুব। তন্ময় হয়ে শুনছিল লক্ষণ।

অন্ধকারে গানের মৃদু গুঞ্জনের মধ্যে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো পান্তা—"ঐ যে বাবা, লুলু—" লুলু ? ছেনো লাফিয়ে পড়ল লক্ষণের কাঁধ থেকে, কানু ভুলু সাইকেল থেকে মাটিতে। অন্ধকারে গলির মধ্যে বহু পুরাতন পাইস হোটেলের পাশে একটা আঁস্তাকুড়ে। লুলু বসে' বসে' কি যেন চিবুচ্ছে, বোধ হয় মাংসের হাড়। বাড়ীর এত কাছে, দুবেলা যাওয়া আসার পথের উপর এত

পরিচিত পাইস হোটেলে লুলু আশ্রয় নেবে একথা কেউ ভাবতেও পারে নি।

হোটেলের ভিতর থেকে উড়িয়া বালকের পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে: "ভাত হাফ্—ডাল—লটপটি—"

লক্ষণ বলল: "ফিরে আয় পান্‌তা—লুলু আর আসবে না, চলে আয়—" লক্ষণকে যেন সাপে ছোবল দিয়েছে, ছটফট করছে যন্ত্রণায়। লক্ষণকে অপমান করেছে লুলু, প্রচণ্ড অপমান—

পান্‌তা বলল: "কেন আসবে না বাবা?"

হোটেলের ভিতর থেকে আবার শোনা গেল: "চোদ্দ নম্বর, ভাত হাফ, ডাল, কুমড়োর কালিয়া—"

"শিগগির চলে আয় পান্‌তা, রাত হয়েছে"। লক্ষণ হন্ হন্ ক'রে চলল ঘরের দিকে।

ছেলেগুলো তখন সকলে মিলে অন্ধকারে ঝুঁকে দেখছে লুলুকে। লুলুর হাড় গোণা যায়। গোল মুখখানার উপর আগুনের মতো চোখ দু'টো জ্বলছে, একদৃষ্টে চেয়ে আছে লুলু কৌতূহলী দর্শকদের দিকে।

কারা এরা? কোন্ জাতের বংশধর? অন্ধকারে হাড়-লিক্‌লিকে ছেনো-কানু-ভুলু-পান্‌তাকে চেনা যায় না ঠিক—

জিব দিয়ে একবার গোঁফ চেটে হোটেলের হেঁসেলের দিকে ঘাড় হেঁট ক'রে চলে গেল লুলু। নটে গাছটিও মুড়িয়ে গেল আঁস্তাকুড়ে।

১৯৪৩

কোটালপুত্র

সকাল থেকে কানু মুখভার ক'রে রয়েছে। পাশের ঘরে প্রতিবেশী ললিতবাবুর ছোট মেয়ে মিনু রোয়াকে বসে পদ্যপাঠ পড়তে পড়তে দু'একবার কানুর মুখের দিকে চেয়ে হেসেছে, কানু উপেক্ষা করেছে। মিনু ভাবছে মনে মনে, কানু বোধ হয় কালকের কাণামাছি ভোঁ ভোঁ খেলার সময় তার দুষ্টুমির কথা ভুলতে পারেনি, রাগ করেছে। মানুকে, হাবু, পেঁচো, হরি সবাই এক একবার হাত চোখ ইসারা ক'রে ডেকেছে কানুকে বাইরে এসে দু'চার দান মার্ব্বেল খেলার জন্যে, কানু সাড়াশব্দ দেয়নি।

রুদ্ধ ঘরে বাবার প্রাণটা ক্রমবিলীয়মান দীপশিখার মতো টিম্ টিম্ ক'রে জ্বলছে, হঠাৎ কখন নিভে যাবে চারিদিক অন্ধকারে ডুবিয়ে—জানে না কেউ। ঝড়ের আভাষ বুঝতে পারে কানু, নীড়ে বসে আধফোটা চোখ দিয়ে আসন্ন ঝড়কে পাখির ছানা যেমন বোঝে তেমনি। ঠিক স্পষ্ট নয়, তাই আরো ভয়ঙ্কর। রোগশয্যা থেকে কাতরকণ্ঠে বাবা ডাকলেন:

"কানু, কি হয়েছে বাবা তোমার?"

ঘরের মধ্যে কানু ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল চুপ ক'রে। মা বললেন, "ভোর থেকে উঠে মুখ হাঁড়ি ক'রে রয়েছে, আদিখ্যেতা। আদর দিয়ে দিয়ে বাঁদর তৈরী করেছে, হাড়েনাড়ে জ্বালিয়ে খেলে একেবারে।" কানু চুপ ক'রে রইল।

আদর! পেট থেকে পড়ে পর্য্যন্ত কেবল দূর ছাই, আর লাথি-ঝাঁটার মধ্যে মানুষ ওরা। শুয়ে শুয়ে ভাবেন রামবাবু। জিল্‌জিলে বুকখানা চিরে দু'এক ফোঁটা জল চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে ময়লা বালিশটার ওপর। একবার শুধু বলেন,—"অমন ক'রে ওদের দূর ছাই করো না গো, করো না।"

এতক্ষণে কানুর নীরবতা ভাঙ্গে। বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো হঠাৎ কান্না ফুলে ওঠে বুক থেকে। হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কানু।

ব্যাপারটা অতি সামান্য। আজ কিছুতেই কানু স্কুলে যাবে না। কেন যাবে না, মরে গেলেও বলবে না সে। পাড়ার দিদিমা কাণিবুড়ি দূর থেকে একবার কানুর বাবার সংবাদ নিতে এসেছিলেন। কানুকে চড়াতে দেখে কানুর মাকে তিনি বললেন,—"মেরোনা বৌমা, আজ যখন যেতে চাচ্ছে না তখন থাক, আজ আর পাঠিও না ইস্কুলে। থাক না আজ বাপের কাছে। হাজার হোক ঐ তো বড়ো। বলা তো যায় না—আর ছোট ছেলের মন, ওরা

ঠিক বোঝে মা ঠিক বোঝে।" কথাগুলো কানে শ্মশানস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে দাঁড়কাকের 'খা, খা' ডাকের মতো শোনায়।

কথার ইঙ্গিত স্পষ্ট। মুখ অন্ধকার ক'রে কানুর মা উঠে চলে যান ঘরে—জবাব দেন না কথার। এ-পাড়ায় কি মানুষ থাকে ?

ছল্ ছল্ চোখে স্কুলে গেল কানু। গলির মুখে আগে থেকে দাঁড়িয়েছিল মিনু, ভেবেছিল কিছু বলবে, সাহস হ'ল না।

স্বর্গীয় পিতার আত্মার উদ্দেশ্যে স্কুলের সেক্রেটারী কিছু দান করবেন মনস্থ করেছেন। ঠিক হয়েছে 'পুওর ফাণ্ডের' টাকায় যে সব গরীব ছেলে স্কুলে পড়ে তাদের তিনি একটা ক'রে খাকির হাফ প্যাণ্ট ও হাফ সার্ট দেবেন, একমাত্র সর্ত্ত তাদের স্কাউট হতে হবে। দানান্তে তাঁর গৃহে আজ এই গরীব ছাত্রদের পৃথক্ ভোজের ব্যবস্থাও হয়েছে।

যথাসময়ে প্রধান শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে ক্লাস থ্রিতে প্রবেশ করলেন সেক্রেটারী ভবানীবাবু। দারোয়ানের হাতে প্যাণ্ট-সার্টের বোচ্‌কা। হেড-মাষ্টার মশাই গরীব ছাত্রদের নাম ডেকে দাঁড়াতে বললেন। আরও দশজনের সঙ্গে দাঁড়াল কানু, ঘাড় হেঁট ক'রে। 'পুওর ফণ্ডের' অর্থে সে পড়ে কিনা! আগে ছিল হাফ-ফ্রি, মাস ছয় হ'ল বাবার দুরারোগ্য ব্যাধির কথা ব'লে ফ্রি হয়েছে। একে একে সকলে দান গ্রহণ করল ভবানীবাবুর হাত থেকে। সকলকে তিনি ব'লে দিলেন, ঘরে ফিরে পোষাক বদলে এই পোষাক পরে' যেন সন্ধ্যার আগেই সকলে তাঁর গৃহে হাজির হয়। আহ্লাদে খুসী হয়ে সকলেই সম্মতি জানিয়ে যায়। আজ হাফ-হলিডে।

এবারে ডাক পড়ল কানুর। কানু নড়ল না একটুও, দাঁড়িয়ে রইল ঠিক তেমনিভাবে ঘাড় হেঁট ক'রে। হেড-মাষ্টার বললেন :—"বেরিয়ে এসো

কানাই !" কানু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে পা ঘষতে থাকে। হেড-মাষ্টার ধমক দিয়ে ডাকলেন: "নিয়ে যাও তোমার প্যাণ্ট সার্ট, কি হয়েছে কি তোমার ?" কানু হেডমাষ্টারের দিকে একবার অনেক কষ্টে মুখ তুলে বলে—"নেব না।" দুই চোখ দিয়ে তার ঝর ঝর ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে কাঠের বেঞ্চের ওপর। আজ সকাল থেকে তার মুখ কি এইজন্যেই মেঘলা হয়েছিল ?

কানুর সহপাঠীরা সকলে বলছিল, কানুর নাকি শাস্তি হবে 'বেত্রাঘাত', আর ছুটির পর একঘণ্টা আটক। হয়েছিলও তাই। এ রকম একগুঁয়ে ছেলে নাকি ভূ-ভারতে নেই।

সেক্রেটারী ভবানীচরণ ফ্রি লিষ্ট থেকে কানুর নাম অবিলম্বে কেটে দেবার নির্দ্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন—"গরীবের বদমায়েস ছেলেদের যদি বিনা পয়সায় লেখাপড়া শেখাতে হয় তাহ'লে গুণ্ডা-ভিখিরীদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করতে হয় আগে। গরীব হ'লেই তার শিক্ষার অধিকার থাকবে না, তাকে ভদ্র, শান্তশিষ্ট, বাধ্য হতে হবে।"

বেতের বাড়িতে হাত-পিঠ ব্যথায় টন্ টন্ করছে। বাবা যদি ছেলের হয়ে ক্ষমা না চায় তাহ'লে কাল থেকে স্কুলের গেট বন্ধ। ঘরে ফিরছে কানু। শতেক তালি দেওয়া ময়লা প্যাণ্টটাতে মাঝে মাঝে হাত দিয়ে চোখের জল রগড়ে মুছছে। তার বাবা কেরাণী, গরীব। জানে সে। তার ওপর প্রায় একবছর কি এক কঠিন রোগে শয্যাশায়ী—পাড়ার সকলে তাদের একরকম

একঘরে ক'রে দিয়েছে। পাড়ার অন্য ছেলে-মেয়েরা তার সঙ্গে খেলে ব'লে তারা কি তাদের বাপ-মায়ের কাছে কম মার খায়। আট বছরের মেয়ে মিনুকে সেদিন তার মা ঘরে হাতে পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল, কানুর সঙ্গে কাণামাছি খেলেছিল—তাই। পাড়ার দিদিমাবুড়ি তাকে বলেছিল 'অসভ্য'—।

দূর থেকে পাড়ার গলিটার মুখে গ্যাসপোষ্টটাকে ধোঁয়া আর অন্ধকারের মধ্যে মনে হ'ল কঙ্কালের মতো। পিসিমার কাছে শোনা সেই অন্ধকার প্রেতপুরীর বিকট প্রহরী যেন! অজানা ভয়ে শিউরে উঠল কানু।

চারিদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়া। সন্ধ্যায় উনুন জ্বলছে। মৌনীবাবার মুখরা উপাসক কাণিবুড়ির সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে রোজকার মতো আজও। গলিটা যেন সেই প্রেতপুরীর সুড়ঙ্গ, যেখান দিয়ে কোটালপুত্র একাই নেমে গিয়েছিল তলোয়ার নিয়ে দৈত্য বধ করতে!

সন্তর্পণে ঢুকল কানু অন্ধকার গলির ভিতর। বাইরের দরজা থেকে দেখল তাদের ঘরের উঠানে ভিড়। পাড়ার মেয়েরা যার যার কাজ সেরে উনুনে আঁচ দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ভিড় ক'রে। কানুকে দেখে কে একজন বললে "হতভাগা ছেলে! এলেন স্কুল পালিয়ে।" আর একজন বললে, "একবার চোখের দেখা দেখতে পেলে না গা! কি কাতরাণিটাই না কাতরেছে কানু কানু ক'রে—হাজার হোক বাপের প্রাণতো—আহা!"

অসহায়ের মতো একবার ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে দেখল কানু চারিদিকে। শীর্ণশান্ত বাবাকে ওরা টান্ টান্ ক'রে শুইয়ে দিয়েছে মেজের ওপর। মা কেঁদে লুটোচ্ছে মাটিতে, পিসিমা তার ছোট ভাইবোন দুটোকে বুকে জড়িয়ে কাঁদছে।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে কারা? কাঠের মানুষ, শুকনো মানুষ, বাঁশের মতো ফাঁপা, কারা ওরা?

একদিকে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কানুর খেলার সাথীরা, হাতে লোহার চাকা আর ডাণ্ডাগুলি।

পাড়াসুদ্ধ লোক কাঁদছে না কেন আজ? কানুর একবার মনে হ'ল। চোখে পড়ল এককোণে দাঁড়িয়ে কাঁদছে শুধু মিনু।

ডুকরে কেঁদে উঠলো কানু। কি যেন খুঁজে পেয়েছে সে তার খেলার সঙ্গিনী মিনুর চোখের জলে।

থর থর ক'রে কানুর জলভরা চোখে বাড়ীটা কেঁপে উঠলো, পাড়াটাকে মনে হ'ল অন্ধকার প্রেতপুরী। আলোক শুধু ঐ মিনুর চোখের অশ্রুকণা। স্কুল আর এ পাড়ার মরুভূমির মধ্যে সমবেদনাতুর মিনুর চোখ দু'টো যেন মরূদ্যান।

মাথার কোঁকড়া চুলগুলো উঠোনে লুটোচ্ছে—কাঁদছে কানু, দৈত্য-পরিবেষ্টিত, নিরস্ত্র কোটালপুত্র।

১৯৪৩